একক ৫ ❑ মুঘল শাসননীতির সংকট

৫.০ প্রস্তাবনা

৫.১ শাজাহানের পর উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত বিরোধ

৫.২ আওরঙ্গজেবের অধীনে সাম্রাজ্যের বিস্তার। সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক সমস্যা ঃ রাজপুতানা ও দা(িণাত্য

৫.৩ আওরঙ্গজেবের দা(িণাত্য সমস্যা

৫.০ প্রস্তাবনা

আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গু(ত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা বিশেষ করে আকবরের পরবর্তী যুগের কথা, মুঘল শহরের শ্রেণীবিন্যাস, নগরজীবন যা কিনা দেশের অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিচায়ক ছিল জানতে পারি।

৫.১ স্বৈরতন্ত্রের সঙ্কট ঃ শাজাহানের পর উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত বিরোধ

১৬৫৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শাজাহান হঠাৎ মূত্রকৃচ্ছরোগ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে আত্র(ান্ত হন। রাজবৈদ্যদের দিবারাত্রির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অসুখ ত্র(মশ বাড়তেই থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যা এত বাড়ে যে সম্রাট শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং রাজদরবারে আসতে অসমর্থ হন। লোকচ(ুর সামনে থেকে সম্রাটের অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয় এবং জনগণ উদগ্রীব হয় পরবর্তী সম্রাট কে হবে তা জানার জন্য। মুঘলদের জ্যেষ্ঠ সন্তানের উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত কোন আইন বা প্রথা ছিল না এবং যখনই সিংহাসন শূন্য হত, শক্তি(র দ্বারা সে বিষয়টির মীমাংসা হত। প্রকৃতপ(ে মুসলিম আইন অনুসারে সম্রাটের বৈধ সন্তানরা শুধু নয়, উপপত্নীদের সন্তানরাও রাজা হতে পারত। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান, প্রত্যেককেই সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। শাজাহানের হঠাৎ অসুস্থতার ফলে তাঁর চার সন্তানের মধ্যে উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। অবশ্য, সব(ে ত্রেই ন্যায্য প্রার্থী যুদ্ধে জয়ী হয়ে সিংহাসন অধিকার করত না, কিন্তু তার জয় তাকে একজন নিপুণ সৈনাধ(্য এবং উন্নততর সামরিক (মতার অধিকারী হিসেবে প্রমাণ করত।

উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত যুদ্ধে মুখ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রত্য(ভূমিকা ছিল শাজাহানের চার পুত্র দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের, যদিও সম্রাটের দুই কন্যা জাহানারা এবং রোশনারা যথাত্র(মে দারা এবং আওরঙ্গজেবের প(সমর্থন করেছিল। প্রত্যেক দাবীদারই পরিণতবয়স্ক ছিল এবং গু(ত্বপূর্ণ প্রদেশে স্বাধীন শাসনকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় এবং প্রশাসনিক জটিলতা সম্পর্কে গু(ত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। দারার বয়স ছিল ৪৩, সুজার ৪১, আওরঙ্গজেবের ৩৯ এবং মুরাদের ৩৩। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ছিলেন সমন্বয়বাদী উদারপন্থী এবং শি(ানুরাগী— যে গুণগুলি ভারতের মত এক বিশাল দেশের সম্রাটের প(মানানসই। তিনি নিয়মিতভাবে মুসলিম সুফী, হিন্দু বেদান্তবাদীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং সমান উৎসাহ নিয়ে তালমাদ এবং নিউ টেস্টামেন্টের নীতিকথা শুনতেন। তাঁর উদ্যোগে উপনিষদ এবং অথর্ববেদের অনুবাদ করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বি(দ্ধভাবাপন্ন মতাদর্শগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। এজন্য, স্বাভাবিকভাবেই তিনি সমধর্মাবলম্বীদের ত্রে(াধ এবং বিরোধিতার সম্মুখীন হন, যারা

আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করে। কিন্তু এই ঘটনা দারাকে সব ধর্মের সহাবস্থানের নীতি প্রচারের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি সম্রাটের সমর্থন পেয়েছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল শাহ বুলন্দ ইকবাল এবং তিনি অভূতপূর্বভাবে ৪০ হাজার অশ্বের ভারপ্রাপ্ত মনসবদার ছিলেন। রাজসভায় তিনি সিংহাসনের কাছেই একটি সোনার আসনে বসতেন এবং পদপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তি(রই সম্রাটের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য দারার মধ্যস্থতার প্রয়োজন হত। শাজাহান দারার প্রতি তাঁর প(পাতিত্বই শুধু প্রকাশ করেন নি, তাঁর অসুস্থতার সময়ে তিনি প্রধান অভিজাতদের এবং রাজকর্মচারীদের আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং ভবিষ্যৎ সম্রাট হিসেবে দারাকে মেনে চলার। পিতার অসুস্থতার সময়ে দারা সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করেন। দারা এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, মূলতানের মত সমৃদ্ধ প্রদেশগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে। কিন্তু তিনি কখনই প্রদেশগুলির প্রশাসনিক কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতেন না, যার ফলে স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর কোন প্রত্য(অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি কখনই সফলভাবে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা না করা সেনাধ(্য হিসেবে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। রাজধানীতে নি(পদ্রব জীবনযাপন করার দ(ণ তাঁর মধ্যে কিছু দুর্বলতা জন্মায়। তিনি ছিলেন বিলাসপ্রিয়, উদ্ধত, চাটুকারিতভক্ত(এবং সম্পূর্ণ বাস্তববোধহীন। ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ লিখেছেন যে সম্মুখযুদ্ধে আওরঙ্গজেবের মত যোদ্ধা এবং কূটনীতিবিদের বি(দ্ধে সফল হবার কোন সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না।

শাহাজানের দ্বিতীয়পুত্র সুজা বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধি, সু(চি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট সাহস, বীরত্ব ছিল এবং তিনি দ(সৈন্য ছিলেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে তাঁর বিলাসপ্রিয়তা, বাংলার সহজ প্রশাসন, এবং প্রায় ১৭ বছর সেই পৌ(ষহীন, দুর্বল দেশে বসবাস তাঁকে দুর্বল, আরামপ্রিয়, অসতর্ক করে তুলেছিল। কঠোর পরিশ্রম, ত্র(মাগত সতর্ক প্রহরার তিনি অনুপযুক্ত(হয়ে পড়েন। এর ফলে তাঁর রাজ্যে প্রশাসনিক শৈথিল্য দেখা যায়, তাঁর সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং প্রশাসনের প্রত্যেক বিভাগে অকর্মণ্যতা প্রকট হয়ে ওঠে। চতুর্থ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মুরাদ গুজরাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ছিল আবেগপ্রবণতা এবং অপরিণামদর্শিতা। একজন সাহসী সৈন্য হওয়া সত্ত্বেও সফল সেনানায়ক হবার দ(তা তাঁর ছিল না। ডঃ ত্রিপাঠী লিখেছেন যে সাহসী, দানশীল হওয়া সত্ত্বেও মুরাদ ছিলেন বিলাসপ্রিয়, অসংযত এবং উদাসীন প্রকৃতির। এসবের সঙ্গে তিনি ছিলেন নির্বোধ, দূরদৃষ্টিহীন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা ছিল তাঁর স্বভাবের অঙ্গ। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অল্প এবং তিনি জ্ঞানলাভের কোন চেষ্টা করেন নি। আত্মতুষ্ট, স্বার্থপর, বিবাদপ্রিয় এবং একগুঁয়ে মনোভাবাপন্ন মুরাদ শাসনভার গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত(ছিলেন।

যোগ্যতমের উদ্‌বর্তনই যদি জীবনের নিয়ম হয়, ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত(ছিলেন আওরঙ্গজেব, যিনি ছিলেন দা(ণাত্যের শাসনকর্তা। তাঁর ছিল সাহস, অটল সংকল্প এবং কূটনীতি ও সামরিক (ে ত্রে গভীর দ(তা। যুদ্ধের নীতি এবং শান্তির শর্তের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সেনাধ(্য এবং প্রশাসক হিসেবে উভয় (ে ত্রেই তিনি প্রতিভা এবং দ(তার প্রমাণ দেন। আরভিন লিখেছিলেন যে তাঁর সরল এবং পরিশ্রমবহুল জীবনে তিনি কখনোই অবসর উপভোগ করেননি। তিনি সেসব বিরল লোকেদের মধ্যে অন্যতম, যারা ভাবে তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে করা কাজগুলিও ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত। একজন নিষ্ঠাবান এবং উৎসাহী সুন্নী মুসলমান হিসাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সনাতন ও নীতিবাগীশ। একারণে তিনি ধর্মান্ধ উলেমা এবং অভিজাতদের সমর্থন লাভ করেন। ডঃ ত্রিপাঠী লিখেছেন যে এই বৈশিষ্ট্য আওরঙ্গজেবের সামর্থ ও দুর্বলতা উভয়েরই কারণ হয়। এটি তাঁর আদর্শ ও পরিকল্পনাকে স্থিরতা দেয়, দৃঢ় বি(শ্বাস এবং অনাড়ম্বর চরিত্র থেকে উদ্ভূত শক্তি(যোগায়, উৎসাহ দেয় এবং ল(্য স্থির থাকা ও ল(্য পূরণে প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি(র সৃষ্টি করে। আবার অন্যদিকে, এই চরিত্রবৈশিষ্ট্য একমুখিতা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভুল ধারণার জন্ম দেয়। একজন শাসকের এই মানসিকতা পরধর্মবিদ্বেষ এবং ধর্মান্ধতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের জন্ম দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিজের ধর্ম ছাড়া অন্যের ধর্মকে

ঘৃণা করার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে এবং আওরঙ্গজেব সুবিচারক হবার প(অযোগ্য হয়ে পড়েন। এর ফলে আওরঙ্গ জেবের প(ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অত্যাচারের নীতি গ্রহণ করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না। এভাবে রাষ্ট্রের মূল কাঠামো ভেঙে পড়ে। এধরনের কাজের পেছনে ছিল আওরঙ্গজেবের ধারণা যে তিনি ঈ(রের আদেশপ্রাপ্ত এবং জাগতিক বাস্তববোধ তাঁকে তাঁর ভ্রান্ত পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

যদি আমরা রাজপুত্রদের চরিত্র বি(-ষণ করি, তাহলে দেখা যাবে যে দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে চতুর্মুখী সংগ্রাম হল উদারনীতি, সনাতনপন্থা, বিলাসপ্রিয়তা এবং অপরিরামদর্শিতার মধ্যে সংগ্রামের প্রতীক যাতে সনাতনপন্থার জয় হয়। দারা প্রগতিশীলতা এবং ভবিষ্যতের প্রতিনিধি ছিলেন এবং আওরঙ্গজেব ছিলেন প্রতিত্রি(য়াশীল শক্তি(এবং ধর্মান্ধতার পূজারী। এসব বি(-ষণ অবশ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে কারণ তরবারিই মুঘল সিংহাসনের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।

রণ(ত্রে কোন নীতি বা বি(াসই একজন রাজপুত্রকে বিজয়ী করার (ত্রে উপযুক্ত(ছিল না। উন্নত রণকৌশল এবং দ(সেনানায়কই যুদ্ধে জয়লাভের সহায়ক হয়। সেনাধ্য(রা, এমনকি রাজপুত নেতারাও অতি সহজে পরাজিত দলের থেকে বিজয়ী দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের পরিবর্তন করতেন, যেখানে ধর্মীয় বিভেদের কোন ভূমিকা ছিল না। হিন্দু অভিজাতরা এবং সাধারণ মানুষ কেউই ভাবতে পারেনি যে আওরঙ্গজেব মুঘল সিংহাসন দখল করার ফলে ধর্মীয় অত্যাচারে ভরা এক শাসনের সূচনা হবে। নিজের পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ব্যবহার নৈতিকতার দিক থেকে নিন্দনীয় হলেও আওরঙ্গজেব দার্শনিক ছিলেন না, সিংহাসন অধিকারই তাঁর ল(্য ছিল। রাজ(মতা দখলের লোভে মত্ত ব্যক্তি(নিজের আত্মীয়দেরও রেহাই দেয় না।

এখন উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বি(-ষণ করা যাক। ১৬৫৭ সালের নভেম্বর মাসে শাজাহান আরোগ্যলাভ করলেও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের শোচনীয় পরিণতি দূর করার প(এখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গিয়েছিল। দারা আগ্রায় তাঁর পিতার নিকটে থাকায় তাঁর নিজের শক্তি(বাড়ানোর সুযোগ ছিল কারণ সম্রাটের অসুস্থতার সময়ে তিনি তাঁর পিতার সমস্ত (মতা প্রয়োগ করেন। মুরাদ জাহানারা বেগমের অধীনে থাকা সুরাট বন্দর অধিকারের জন্য ৬০০০ অ(ারোহী সৈন্য পাঠান এবং দেওয়ান মীর আলিকে নকিকে হত্যা করেন। ১৬৫৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর মুরাদ নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করার পর খুতবা নিজের নামে পড়ার ব্যবস্থা করেন এবং মুদ্রার ওপর নিজের নাম খোদাই করেন। বাংলায় সুজা নিজের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন রাজমহলে। কিন্তু আওরঙ্গ জেব দ্রুত নিজের অভিষেকের কোন আয়োজন করেননি। তিনজন ভাই নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তারা ধর্মদ্রোহী ও ইসলামবিরোধী দারার বি(দ্ধে একত্রিত হবার পরিকল্পনা করেন। বিদ্রোহী তিন রাজপুত্র ইসলামের নামে দারাকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং ইসলামের র(কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইসলাম বিপন্ন হওয়ার এই প্রচার জনগণের মধ্যে অতি সহজেই উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

শাজাহান যখন রাজপুত্রদের ঘৃণ্য আচরণের কথা জানলেন, তখন তিনি তাদের শাস্তির জন্য সৈন্য পাঠানোর অনুমতি দেন। সেজন্য বিদ্রোহী রাজপুত্রদের গতিরোধের জন্য দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে তিন ভাগে বিভক্ত(এক সৈন্যদল পাঠান হয়। সুজা, যিনি প্রথম আত্র(মণে উদ্যোগী হন, বারাণসীর কাছে পরাজিত হন দারার পুত্র সুলেমান শিকো এবং কচ্ছের রাজা জয় সিংহের নেতৃত্বে প্রেরিত মুঘল বাহিনীর কাছে। নর্মদার কাছে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের দিল্লী অভিমুখী সৈন্যদল একত্রিত হয়। ইতিমধ্যেই দুই ভাই সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার শপথ গ্রহণ করেন ঈ(রের এবং মহম্মদের নামে। চুক্তি(র শর্তগুলি ছিল—

(১) যুদ্ধে জয় করা সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মুরাদের এবং দুই-তৃতীয়াংশ আওরঙ্গজেবের থাকবে

(২) বিজয়ের পর পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর এবং সিন্ধ লাভ করবেন মুরাদ, যিনি মুদ্রা প্রচলন করবেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করতে পারবেন।

দুজন বিদ্রোহী রাজপুত্রের সম্মিলিত বাহিনীর মহারাজ যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বাধীন মুঘল সৈন্যদলের সঙ্গে ধর্মাতে সংঘাত হয়। ভয়াবহ এই যুদ্ধে মারাত্মক (য়(তির পর মুঘল সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে। রাঠোররা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কাশিম খাঁ নিণি(য় ছিল। যখন যশবন্ত সিংহ যোধপুরে পালিয়ে যান তখন তাঁর গরিমাময়ী পত্নী দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেন স্বামীর যুদ্ধ(ত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের প্রতিবাদে। ধর্মাতের যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের সম্মান বৃদ্ধি করে। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে দা(ণাত্য যুদ্ধের নায়ক শুধুমাত্র যে কোন (য়(তি ছাড়াই যুদ্ধে জয়ী হন, তাই নয়, তাঁর সামরিক খ্যাতি তাঁকে ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। দ্বিধাগ্রস্তেরা আর ইতস্তত না করেই বুঝতে পারে যে চার ভাইয়ের মধ্যে কোনজন বিজয়ী হবার উপযুক্ত(।

চম্বল অতিত্র(ম করে বিজয়ী রাজপুত্রেরা সামুগড়ের প্রান্তরে উপস্থিত হন। আওরঙ্গজেবকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করা এবং মুসলিমদের জীবনহানি প্রতিরোধের জন্য শাজাহান ও জাহানারার চেষ্টার কোন ফল হয় নি। পরিবর্তে আওরঙ্গজেব দারার প্রতি প(পাতিত্বের জন্য সম্রাটকে অভিযুক্ত(করেন। শুধুমাত্র রণ(ত্রেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। ৫০,০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে দারা অগ্রসর হন। ১৬৫৮ সালের ২৯শে মে এক নৃশংস যুদ্ধ হয়। রাজপুতদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও দারার কৌশলগত ত্রুটি জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে। যখন দারার হাতি তীরবিদ্ধ হয়, দারা হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়েন। স্মিথের মতে এই ঘটনা যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করে দেয়। হাতির উপর তাদের নেতাকে দেখতে না পেয়ে মুঘল সৈন্যরা দারাকে মৃত বলে ধরে নেয় এবং বিভ্রান্ত হয়ে রণ(ত্র ছেড়ে চলে যায়। যদি কোন সৈন্যবাহিনীকে ভীতি গ্রাস করে তাহলে কোন শক্তি(ই তাদের পরাজয়ের হাত থেকে র(া করতে পারে না। প্রকৃতপ(সামুগড়ের যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করে। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ নয়।

সামুগড়ের যুদ্ধে জয়ের পর আওরঙ্গজেব আগ্রার দিকে রওনা হন। যদিও পিতাপুত্রের মধ্যে সন্ধির চেষ্টা হয় সেটি পূর্বের সব প্রয়াসের মতই ব্যর্থ হয়। আওরঙ্গজেব আগ্রার দুর্গ আত্র(মণ করেন এবং যখন দুর্গর(ীরা আত্র(মণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে তখন তিনি যমুনা থেকে দুর্গে জলসরবরাহ বন্ধ করে দেন এবং এভাবে ১৬৫৮ সালের ৮ই জুন দুর্গ অধিকার করেন। দুর্গের জলসরবরাহ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন প্রবল প্রতিপত্তিশালী ভারত সম্রাটকে দুর্গের মধ্যের কূপের জলের দ্বারা তৃষ(ানিবারণ করতে হয়। শাজাহান অত্যন্ত বেদনাদগ্ধ হয়ে লিখেছেন যে হিন্দুরা প্রশংসনীয় কারণ তারা মৃত্যুপথযাত্রীদের জল দেয় এবং আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও পিতার জলকষ্টের কারণ হন।

এই প্রার্থনায় আওরঙ্গজেব কর্ণপাত করেননি। অবশেষে সম্রাট অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং অভিযোগ করা বন্ধ করে দেন। ধর্মের মধ্যে তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান এবং আত্মসমপর্ণের মনোভাব নিয়ে প্রার্থনা আর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন শু(করেন।

আগ্রায় আওরঙ্গজেব আমীরদের আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং কার্যত শাসকে পরিণত হন। এখন তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন এবং পথে শুধুমাত্র কৌশলের আশ্রয় নিয়ে মথুরার কাছে মুরাদকে বন্দী করেন। দিল্লীতে ১৬৫৮ সালের ২১শে জুলাই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং আলমগীর উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল নিজের ভাইদের এবং সিংহাসনের অন্য দাবীদারদের নির্মূল করা। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তিনি এই কাজ সম্পূর্ণ করেন। সুজা যিনি সিংহাসন দখলের জন্য নতুনভাবে চেষ্টা করেন, এলাহাবাদের কাছে খাজায় পরাজিত হন ১৬৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারী। মীরজুমলা তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও সম্ভবত আরাকানবাসীরা তাঁকে হত্যা করে। মুঘল বাহিনী ১৬৫৯ সালের ২৩শে আগস্ট মুরাদকে বন্দী করে দিল্লীতে আনে এবং ১৬৫১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করা হয়। দিল্লীতে মুরাদকে এবং তাঁর পুত্র সিফির শিকোকে অপরিচ্ছন্ন হাতির পিঠে বসিয়ে অপমানজনকভাবে ঘোরান হয়। এই ঘটনার একজন প্রত্য(দর্শী হিসেবে বার্ণিয়ার লিখেছেন যে সর্বত্র নরনারী এবং শিশুরা দারার দুর্ভাগ্যের জন্য অনুতাপ করছিল এবং মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে আসার জন্য বিলাপ

করছিল। এই পরিস্থিতিতে দারাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা আওরঙ্গজেবের প(বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল না। দারার বিচারের জন্য সভার আয়োজন করা হয়। উলেমারা দারাকে ইসলামধর্ম বিরোধী এবং প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত(বলে ঘোষণা করেন। আওরঙ্গজেব দারার আবেদনের উত্তরে দারাকে (মার অযোগ্য আখ্যা দেন। ১৬৫৯ সালের ৩০শে আগস্ট দারার শিরচ্ছেদ করা হয় এবং তাঁর মৃতদেহ রাস্তায় প্রদর্শন করা হয় যাতে জনগণ তাদের প্রিয় রাজপুত্রের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারে।

আওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা নিষ্ফল। মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাঁর সৌভাগ্যের ওপর গু(ত্ব আরোপ করেছেন। বিজয়ী ব্যক্তি(র গুণের অতিরঞ্জন এবং পরাজিতের নিন্দা ঐতিহাসিকদের রীতি। সেজন্য একটি মত প্রচলিত যে আওরঙ্গজেব ছিলেন কৌশলী এবং দ(সেনানায়ক। ডঃ ত্রিপাঠী সঠিকভাবেই লিখেছেন যে আওরঙ্গ জেবের কাছে দারার পরাজয় যদিও আওরঙ্গজেবের উন্নত সামরিক শক্তি(র পরিচায়ক তবুও তা দারাকে অনুপযুক্ত(প্রমাণ করে না। যুদ্ধ(ত্রে সাফল্য এমন অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে যা একজনের ব্যক্তি(গত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না। দার্শনিকের মত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভাগ্য ভারতবর্ষে মুঘল শাসন দীর্ঘায়ত করার বি(দ্ধে ছিল। বাবরের সাম্রাজ্যকে আকবর যদি শক্তি(শালী করে থাকেন, এর ভাঙনের সূত্রপাত করেন আওরঙ্গজেব।

৫.২ আওরঙ্গজেবের অধীনে সাম্রাজ্যের বিস্তার, সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক সমস্যাঃ রাজপুতানা ও দা(ণাত্য

আওরঙ্গজেবের শাসন শাজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি থেকে অষ্টাদশ শতকের ভাঙনের মধ্যবর্তী পর্যায় ছিল। বহুকাল ধরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বি(্বাস প্রচলিত যে ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেব পুরোহিততন্ত্র বা দিব্যতন্ত্রের সূচনা করেন এবং তাঁর নীতি সাম্রাজ্যে সাংগঠনিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন রাজত্বের প্রথম থেকেই আওরঙ্গজেব দিব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ফা(কী উল্লেখ করেছেন যে আওরঙ্গজেব বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার বি(দ্ধে ছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ব্যক্তি(গত বি(্বাস অনুসারে একজন গোঁড়া মুসলমান হিসেবে আওরঙ্গজেব রাজনৈতিক প্রয়োজনকেই সনাতনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে বাধ্য হন। সতীশচন্দ্রের বক্ত(ব্য ছিল ধর্ম বিপন্ন এই মত প্রচারিত হত শাসকদের ব্যক্তি(গত উচ্চাকাঙ(া পূরণের উদ্দেশ্যে। শ্রী রাম শর্মা বলেছেন ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ মুসলিম উলেমাদের জয়কে চিহ্নি(ত করে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে ইসলাম ধর্মের প্রতি আওরঙ্গজেবের অনুরাগ রাজনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা প্রশমিত ছিল।

সেজন্য গোঁড়ামি সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি এবং রাজনৈতিক কর্ম এমনভাবে পরিকল্পিত যে তাতে রাজনীতির প্রয়োজনকে উপে(া করে ব্যক্তি(গত মতকে প্রাধান্য দেবার কোন সুযোগ ছিল না। এই রাজনীতির প্রয়োজন স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল ছিল না। আথার আলীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ ডঃ সরকার এবং ডঃ শর্মার অভিমতের থেকে ভিন্ন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা গু(ত্বপূর্ণ যে আওরঙ্গজেব কখনই আ(রিক অর্থে দিব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন নি। প্রকৃতপ(তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, যাঁর শাসনে ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী সুন্নী মুসলমান, নীতিবাগীশ এবং ব্যক্তি(গত জীবনে ধর্মোন্মাদ। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রতি তিনি অন্ধ ছিলেন না। ভারতবর্ষে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও তিনি জানতেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক মিশ্র জনগণকে তিনি শাসন করছেন। যার মধ্যে বেশীসংখ্যক মানুষই অমুসলমান। সেজন্য রাজত্বের সূচনা থেকেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা তাঁর প(সম্ভব ছিল না এবং তাঁকে তাঁর সনাতনপন্থী নীতি অনুসরণ করতে হয় কয়েকটি ভিন্ন পর্যায়ে।

আবার একই সময়ে আওরঙ্গজেবের মূল উদ্দেশ্য ছিল বহু ঈ(রের পূজা বন্ধ করা এবং ভারতবর্ষকে দার-উল-হার্ব থেকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার জন্য জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়া। সনাতনপন্থী ইসলামের শাসন শক্তি(শালী করার জন্য তিনি তাঁর শাসনের সূচনা করেন কয়েকটি মুসলিম নীতি ঘোষণা করার মাধ্যমে।

রাজপুতানার সমস্যা ঃ যদি আকবর তাঁর বিচ(ণতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান দ্বারা রাজপুতদের বন্ধুত্ব এবং সমর্থন লাভের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন, আওরঙ্গজেব তাহলে সেসব হারান তাঁর নির্বুদ্ধিতা এবং ধর্মোন্মদনার জন্য। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরিণতি হয়। ভাসা-ভাসা ভাবে এটাই শুধু বলা যেতে পারে যে সমধর্মালম্বী না হওয়ায় আওরঙ্গজেব রাজপুতদের ঘৃণা করতেন এবং নীতিবাগীশ সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন এবং উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত যুদ্ধে রাজপুতরা আওরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী দারার সঙ্গে একত্রিত হয়। কিন্তু সেগুলিই মূল কারণ হলে আওরঙ্গজেব অম্বরের রাজা জয়সিংহ এবং যোধপুরের রাজা যশবন্ত সিংহকে মুঘল প্রশাসনে নিযুক্ত(রাখতেন না এবং তাঁর শাসনের দু-দশক পরেও সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব এবং মনসবের অধিকার তাঁদের ভোগ করতে দিতেন না। রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ ছিল যে অত্যন্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে আওরঙ্গজেব প্রত্যেক উপজাতি এবং সম্প্রদায়কে অবদমিত করতে এবং তাদের নিজস্ব অঞ্চল প্রত্য(ভাবে মুঘল নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হন। এর ফলে তিনি রাজপুতদের সঙ্গে মহামূল্যবান সম্পর্ক নষ্ট করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশেই তিনি যুদ্ধ করেন এবং তাঁর পাঁচ দশকের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমে প্রাথমিক অভিযান থেকে শু(করে জীবনের শেষভাবে মারাঠাদের সঙ্গে সংগ্রাম পর্যন্ত তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যত্র(মে লাভের পরিবর্তে তিনি সবই হারান এবং বিখ্যাত মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে তিনি শুধু নিজেরই নয়, অন্যদের জীবনেও দুঃখ এবং দুর্ভাগ্য নিয়ে আসেন।

যখন আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজপুতরা নিজেদের রাজ্যে শান্তিতেই ছিল। রাজপুতদের তিনজন বিখ্যাত রাজার মধ্যে মাড়ওয়াড়ের রাজা যশবন্ত সিংহ এবং অম্বরের রাজা জয়সিংহ মুঘল সৈন্যবাহিনীতে মনসবদারী ভোগ করতেন। তৃতীয় রাজপুত রাজা, মেবারের রাণা রাজ সিংহ মুঘল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন এবং শাজাহানের রাজত্বকালেই মুঘলদের কাছে (মাপ্রার্থী হন। এসব সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব শিবাজীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে রাজপুত রাজাদের সন্দেহ করতেন এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের থেকে মুক্তি(পেতে চান। স্যার যদুনাথ সরকার এবং ডঃ দত্তের মতে ১৬৬৭ সালে দা(ি ণাত্যে আওরঙ্গজেব বিষপ্রয়োগ করে প্রথমে রাজা জয় সিংহকে হত্যা করেন এবং ১৬৭৮ সালে এগারো বছর পর খাইবার পাসের জম(দ দুর্গে মুঘলদের সেনানায়ক হিসেবে যশবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। যশবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারী না থাকায় আওরঙ্গজেব মৃত রাজার প্রদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তীকরণ এবং কেন্দ্রীয় শক্তি(র বি(দ্ধে হিন্দুদের দমন করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। মাড়ওয়াড় রাজ্যকে মুঘল প্রশাসনের প্রত্য(নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আদেশ জারী করা হয় এবং স্থানীয় শাসনকার্যের জন্য ফৌজদার, কোতোয়াল এবং আমীর নিয়োগ করা হয়। পরিকল্পনা সফল করার জন্য আওরঙ্গজেব আজমীর যান। রাজপুত অঞ্চল অধিকারের জন্য রাঠোড়দের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে আওরঙ্গজেব যোধপুরের খুব কাছেই আজমীরে উপস্থিত হন। ১৬৭৯ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি রক্ত((য় ছাড়াই মাড়ওয়াড়ের আনুগত্য আদায় করে খুশীমনেই দিল্লী ফিরে যান। সেই একই দিনে তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়াকর পুর্ণপ্রবর্তন করেন, যেটি প্রায় একশ বছর আগে তাঁর প্রপিতামহ আকবর রদ করেছিলেন। অল্প পরেই নাগৌরের রাজা ইন্দ্র সিংহের কাছে যোধপুর বিত্র(ী করে দেওয়া হয় ছত্রিশ লাখ টাকার বিনিময়ে। রাজা ইন্দ্র সিংহ বংশানুত্র(মিকভাবে মুঘল সামন্ত ছিলেন এবং তিনি উত্তরাধিকারসংত্র(ান্ত কর প্রদান করেন। কিন্তু জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ রাজা ইন্দ্র সিংহকে সাহায্যের জন্য মুঘল রাজকর্মচারীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল।

এই সবকিছুই পরাত্র(মশালী রাঠোড়দের অসন্তোষকে বাড়িয়ে তোলে। এগুলির সঙ্গে আর একটি কারণ যুক্ত(হয়।

মহারাজা যশবন্ত সিংহের দুজন রাণী তাঁদের স্বামীর মৃত্যুর পর দুই পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। ১৬৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যোধপুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে। দুর্ভাগ্যত্র(মে জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দুই পুত্রের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। যশবন্ত সিংহের বি(স্ত, অনুগত কর্মচারীরা তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অজিত সিংহকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন এবং মৃত রাজার স্থানে তাঁর শিশুপুত্রের উত্তরাধিকারের দাবী স্বীকার করার জন্য আওরঙ্গজেবের কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব শিশু রাজপুত্রকে মুঘল হারেমে পাঠানোর আদেশ দেন যেখানে সে রাজকীয় তত্ত্বধানে প্রতিপালিত হবে এবং পরিণতবয়স্ক হবার পর সে রাজা হতে পারবে। রাজপুতদের ভীতি ছিল যে অজিত সিংহকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হতে পারে এবং ধর্মান্তরিত হলে তবেই সে সিংহাসন লাভ করবে। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে ১৭০৩ সালে কারা(দ্ধ শাহুকে দেওয়া এধরনের প্রস্তাবের দৃষ্টান্ত থেকে এটিই আমাদের বি(াস হয়। সম্রাটের প্রস্তাব রাঠোড়রা সমর্থন করেনি এবং তারা তাদের মৃত রাজার শিশুপুত্রকে যেকোন মূল্যের বিনিময়ে র(া করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সৌভাগ্যত্র(মে তাদের দুর্গাদাস নামে একজন সাহসী, নিষ্ঠাবান এবং কর্মঠ নেতা ছিলেন। রাজপুত শৌর্যের প্রতীক হিসেবে তাঁর স্মৃতি এখনও রোমন্থন করা হয় রাজপুত গাথায়।

আওরঙ্গজেবের প্রস্তাবে দুরভিসন্ধির আভাস পেয়ে তিনি শিশু রাজপুত্র এবং দুজন রানীকে নিয়ে মাড়ওয়াড় পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। যখন মুঘল বাহিনী রাজা যশবন্ত সিংহের শিশুপুত্র এবং রানীদের দুজনকে বন্দী করার চেষ্টা করে, রঘুনাথ ভাট্টি প্রায় একশ মৃত্যুভয়হীন সৈন্য নিয়ে রাজসৈন্যদলের বি(দ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিশৃঙ্খলতার সুযোগে, রাজপুত শিবির থেকে দুজন রানীকে পু(ষের ছদ্মবেশ পরিয়ে শিশুপুত্রসমেত দুর্গাদাস পলায়ন করেন। বীর শহিদ হিসেবে রঘুনাথ এবং তাঁর অনুচরদের মৃত্যুর আগেই দুর্গাদাস দিল্লী ছেড়ে নয় মাইল চলে যান। যদিও মুঘল বাহিনী তাঁকে অনুসরণ করে, রণছোড়দাস যোধার নেতৃত্বে রাজপুত সৈন্যরা মুঘলদের সঙ্গে রক্ত((য়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই ত্র(মাগত যুদ্ধ শিশু রাজপুত রাজপুত্রকে বন্দী করার জন্য মুঘল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার (ে ত্রে দুর্গাদাসের সহায়ক হয় এবং ১৬৭৯ সালের জুলাই মাসে নিরাপদে যোধপুরে পৌঁছে তিনি একটি সুর(ি ত স্থানে শিশুটিকে লুকিয়ে রাখতে স(ম হন। হতাশ হয়ে আওরঙ্গজেব একজন গোয়ালার পুত্রকে প্রকৃত অজিত সিংহ হিসেবে উপস্থিত করেন এবং যে শিশুকে দুর্গাদাস যোধপুরে নিয়ে যান তাকে নকল রাজপুত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। রাঠোড়দের শাসন করতে অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি সম্রাট ইন্দ্র সিংহকে পদচ্যুত করে সমগ্র মাড়ওয়াড় এক মুঘল সেনানায়কের অধীনে নিয়ে আসেন।

সফলভাবে রাজপুত প্রতিরোধের মোকাবিলা করার জন্য আওরঙ্গজেব ১৬৭৯ সালের অক্টোবর মাসে আজমীরে পৌঁছান এবং রাঠোড়দের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রাজপুত্র আকবর এবং তাহাভুর খানের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। রাজপুতদের পরাজয়ের পর মাড়ওয়াড় মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(করা হয় এবং বিভিন্ন জেলায় ভাগ করে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। ডঃ ঈ(রী প্রসাদের মতে এটি ছিল উদ্দাম সাম্রাজ্যবিস্তারের এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর ফলে রাজপুতদের দুটি উপজাতি-রাঠোড় এবং শিশোদিয়ারা একত্রিত হয়। শিশোদিয়াদের মহারাণা রাজসিংহ ছিলেন অজিত সিংহের জননীর সহোদরভ্রাতা। তিনি বুঝতে পারেন যে আওরঙ্গ জেবের দ্বারা মাড়ওয়াড়ের নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতের মেবার জয়েরই দ্যোতক। সেজন্য তিনি রাঠোড়দের প(সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিশোদিয়ারা কোন উপযুক্ত(প্রস্তুতি নেবার আগেই, রণকৌশল আর পরিকল্পনায় দ(আওরঙ্গজেব মেবার আত্র(মণ করেন। সাহসী রাজপুতরা শক্তি(শালী কামানে সুসজ্জিত মুঘল বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলে রাজ সিংহ এবং ইউরোপীয়রা আত্মর(ার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় নেন। মুঘলরা উদয়পুর এবং চিতোর জয় করার পর সেখানকার সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে। হাসান আলীর নেতৃত্বে সৈন্যদল পার্বত্য অঞ্চলে মহারাণাকে তাড়া করে যায় এবং তাঁর সম্পত্তি এবং গোলাবা(দ দখলের দ্বারা ১৬৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে পরাজিত করে। মেবারের শক্তি(বিনষ্ট করার পর সম্রাট সন্তুষ্টচিত্তে ১৬৮০ সালের মার্চ মাসে আজমীরে ফিরে যান। বারো হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে থাকা রাজপুত্র আকবরের শাসনাধীনে রাখা হয় চিতোরকে।

এটি সত্য যে রাজপুতদের (মতা নষ্ট করে তাদের রাজ্য অধিকার করলেও আওরঙ্গজেব তাদের শৌর্য এবং আত্মমর্যাদার অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হন। মুঘলদের বি(দ্ধে তাদের যুদ্ধ বন্ধ করা যায় নি। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে সমগ্র রাজপুতানায় মুঘল বিরোধিতার আগুন জ্বলতে থাকে। মুঘল অধীনস্থ মেবার এবং মাড়ওয়াড় আরাবল্লী পর্বত দ্বারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় রাজসিংহ তাঁর সৈন্য নিয়ে ওই পর্বতে আশ্রয় নেন এবং পূর্ব বা পশ্চিমে মুঘল বাহিনীর ওপর অতর্কিতে আত্র(মণ শু(করেন। মুঘলদের প(চিতোর থেকে মাড়ওয়াড়ে সৈন্য পাঠান কষ্টকর এবং পরিশ্রমসাধ্য হয়ে ওঠে। এসব প্রতিবন্ধকতার কুফল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন শিশোদীয়ারা মুঘল সৈন্যদের মধ্যে তীব্র ভীতি সৃষ্টি করে এবং রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করে দেয়। শিশোদিয়াদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ আকবরকে আওরঙ্গজেব মাড়ওয়াড়ে স্থানান্তরিত করেন এবং আজমকে চিতোরে সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব দেন। এর ফলে আকবরের দম্ভে আঘাত লাগে কারণ তিনি যথার্থই বোঝেন যে তাঁর নিজের ত্রুটি নয়, প্রতি কূল পরিস্থিতিই তাঁর ব্যর্থতার কারণ। সেজন্য তিনি বি(্বাসঘাতকার কথা ভাবেন এবং রাজপুতদের সাহায্যে পিতার রাজমুকুট ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। রাজপুতরা এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানায় এবং রাজপুত্রকে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৬৮১ সালের জানুয়ারী মাসে আকবর নিজেকে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করেন যখন তাঁর বেতনভোগী চারজন উলেমা নির্দেশনামা জারী করেন যে ইসলাম ধর্মের নীতির বিরোধিতার মাধ্যমে আওরঙ্গজেব সিংহাসনের ওপর তাঁর অধিকার হারিয়েছেন। সেসময়ে আজমীরে শক্তি(শালী সৈন্যবাহিনী না থাকায় হতাশ আওরঙ্গজেব নিজেকে অসহায় এবং নিরাপত্তাহীন মনে করেন।

দুর্ভাগ্যত্র(মে আকবর নিজে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। তিনি বিলাসিতায় সময় নষ্ট করেন। দিনে দিনে আওরঙ্গজেবের শক্তি(বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যখন মুঘল বাহিনী আজমীর পৌঁছয়। রাজপুত্র মুয়াজ্জম সম্রাটের সঙ্গে একত্রিত হলে মুঘল সেনাবাহিনীর শক্তি(প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখনও মুঘলদের সমর্থনকারী এবং বিদ্রোহীরা যদি সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হত তাহলে যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করা কঠিন ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূটনীতি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দেয়। পরিকল্পনামাফিক রাজপুতদের প্রতারণা করার জন্য আকবরকে প্রশংসা করে আওরঙ্গজেব একটি চিঠি পাঠান এবং রাজপুত নেতাদের হাতে সেই চিঠি পৌঁছবার ব্যবস্থা করেন। এতে কাজ হয় এবং রাজপুতরা আকবরকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আকবর নিরাপত্তার জন্য শুধুমাত্র রাজপুতদের শরণাপন্ন হলে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। নিজেদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজপুতরা যেকোন মূল্যের বিনিময়ে বিদ্রোহী রাজপুত্রকে তাঁর পিতার হাত থেকে র(ার সংকল্প করেন। আবার রাঠোড় নেতা দুর্গাদাস তাঁর সাহসের পরিচয় দেন এবং মুঘলদের বন্দী করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে আকবরকে নিরাপদে মারাঠী রাজা শম্ভুজীর রাজসভায় পৌঁছনোর ব্যবস্থা করেন।

আকবরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সেটি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। অবশেষে আওরঙ্গজেব রাজপুতানার পরিবর্তে দা(ণাত্যে যুদ্ধে অংশ নেন এবং সেখানেই মুঘল সাম্রাজ্যের কবর খনন করেন। আওরঙ্গজেব রাজপুতানা ছেড়ে যাবার আগেই মুঘল এবং শিশোদিয়াদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় ১৬৮১ সালের জুন মাসে। সন্ধির শর্তগুলি ছিল— (ক) জিজিয়া কর দেবার বিনিময়ে মহারাণা মন্ডলপুর এবং বিদৌর পরগণা মুঘলদের অধীনের ছেড়ে দেয়। (খ) মুঘলরা মেবার থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং (গ) মহারাণা রাজ সিংহের পুত্র, জয়সিংহ মেবারের রাণা হিসেবে স্বীকৃতি পান এবং পাঁচহাজারী মনসবদারী লাভ করেন।

তা সত্ত্বেও রাঠোড়রা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মুঘলদের বি(দ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে যতদিন না পর্যন্ত মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ মাড়ওয়াড়ের উপর অজিত সিংহের দাবী স্বীকার করে নেন।

আওরঙ্গজেবের রাজপুত যুদ্ধের পরিণতি ছিল ভয়াবহ। ডঃ ঈ(্বরী প্রসাদ লিখেছেন যে রাজপুত যুদ্ধের ফলে আওরঙ্গজেবের অর্থ এবং সৈন্যের প্রভূত (তি হয় এবং ভারতবর্ষে তাঁর সম্মানহানি ঘটে। স্যার যদুনাথ সরকারের আ(প যে চরম রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে আওরঙ্গজেব বি(্বস্ত রাজপুতদের বিদ্রোহের পথ বেছে নিতে

প্ররোচিত করেন যখন সীমান্তবর্তী আফগানদের সম্পূর্ণ দমন করা যায় নি। দুটি প্রখ্যাত রাজপুত উপজাতি আওরঙ্গজেবের বিরোধিতা করায় মুঘল বাহিনী সবচেয়ে দ(এবং বি(স্ত সৈন্যদের নিয়োগ করতে ব্যর্থ হন। ত্র(মশ রাঠোড় এবং শিশোদিয়াদের থেকে হারা আর গৌর উপজাতির মধ্যেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মালবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ভারতের সর্বত্র মুঘলদের বিরোধিদের অনুপ্রাণিত করে। স্ট্যানলি লেনপুলের মতে মহান আকবরের সিংহাসনে আওরঙ্গজেবের মত ধর্মান্ধ ব্যক্তি(বসায় রাজপুতরা তাঁকে র(া করার জন্য কোনকিছুই করতে প্রস্তুত ছিল না। নিজের দ(িণ হস্ত হারানোর পর আওরঙ্গজেবকে তাঁর দা(িণাত্যের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

৫.৩ আওরঙ্গজেবের দা(িণাত্য সমস্যা

তাঁর রাজত্বকালের প্রথমার্ধে দা(িণাত্যে সাম্রাজ্যবিস্তার এবং অন্য রাজ্য অন্তর্ভুক্তি(করণের কোন নীতি আওরঙ্গজেব গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এই নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যখন সম্রাটের বিদ্রোহীপুত্র আকবর রাজপুতদের সাহায্যে মুঘল সিংহাসন দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর দা(িণাত্যে পালিয়ে যান এবং শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর রাজসভায় উষ(অভ্যর্থনা লাভ করেন। আওরঙ্গজেবের ভাষায় 'ভারতের শান্তিবিনষ্টকারী' এবং 'শয়তান পিতার শয়তানপুত্রের' একত্রিত হওয়া তাঁকে অসন্তুষ্ট করে এবং নিজের পলাতক পুত্র এবং তার সহযোগী শম্ভুজীকে শাস্তি দেবার জন্য সম্রাট সশরীরে দা(িণাত্যে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত নেন। শিয়ারাজ্য বিজাপুর ও গোলকুন্ডা ধ্বংস করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ১৬৮১ সালের জুন মাসে মেবারের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের পর তিনি আজমীর ছেড়ে দা(িণাত্যে রওনা হন ১৬৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর। ১৬৮২ সালের ১লা এপ্রিল সম্রাট আহম্মদনগর পৌঁছন। কখনোই তিনি মানসচ(দেখতে পাননি যে দা(িণাত্যে যাত্রা তাঁর ধ্বংসের সূচনা করবে। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি দা(িণাত্যে কাটান এবং তাঁর মৃতদেহ সেখানেই কবর দেওয়া হয়। দৌলতাবাদের কাছে খুলদাবাদে তাঁর কবর বাবরের সাম্রাজ্যের পতনকে চিহ্নি(ত করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শক্তি(শালী মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

রাজপুত্র আকবরকে বন্দী করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আওরঙ্গজেব চার বছর কাটান এবং মারাঠাদের বি(দ্ধে রক্ত((য়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন। একই সঙ্গে তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা জয়ের উদ্যোগ নেন। তাঁর দা(িণাত্যের এই দুটি শিয়া রাজ্যকে তাঁর হিন্দু রাজ্যগুলির মতই খারাপ মনে হয় এবং তিনি সেগুলিকে মৃতদেহভ(ণকারী দানব ও বিধর্মী আখ্যা দেন। সম্রাট এই প্রদেশগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(করে রাষ্ট্রের গৌরব বাড়াতে চান এবং সরাসরি মারাঠাদের মোকাবিলার চেষ্টা করেন। ১৬৮৫ সালের ১১ই এপ্রিল মুঘলরা বিজাপুর অবরোধ করলেও সেখানে সৈন্যরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রায় একবছরের বেশী সময় ধরে অবরোধ চলে। অবশেষে যখন দুর্গের রসদ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় এবং দুর্ভি(বহুলোকের মৃত্যু হয় তখন বাধ্য হয়ে ১৬৮৬ সালে বিজাপুরিরা আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ী মুঘল বাহিনী শহরে প্রবেশ করে ধ্বংসলীলা চালায়। দুর্গের বেশ কিছু দেওয়ালচিত্রকে শরিয়তবিরোধী আখ্যা দিয়ে আওরঙ্গজেব নষ্ট করেন। বিজাপুর প্রদেশকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(করা হয় এবং বছরে এক লাখ টাকা অবসরগ্রহণের ভাতা হিসেবে পান বিজাপুরের শাসক।

মুঘল বাহিনীর পরবর্তী ল(্য ছিল গোলকুন্ডা জয় করা। ১৬৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে দুর্গ অবরোধ করা হয়। দুর্গর(ীদের যথেষ্ট রসদ ছিল এবং তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। অবরোধ চলতে থাকায় মুঘল বাহিনীর যথেষ্ট (য়(তি হয় এবং দুর্ভি(এবং মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করে অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে থাকেন। আট মাস কেটে যাওয়ার পরও সাফল্যের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। বীরত্ব বিফল হলে মুঘলরা বি(শ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নেয়। সম্রাট আবদুল্লা পানি নামে গোলকুন্ডার সুলতানের একজন গু(ত্বপূর্ণ কর্মচারীকে ঘুষ দেন। সে দুর্গের পূর্বদিকের ফটক ফুলে রেখে দেয় এবং এভাবে মুঘল সৈন্যদের দুর্গে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। কিন্তু দুর্গ মুঘলদের দ্বারা আক্র(ান্ত হবার আগে আবদুর রজ্জাক লারী নামে গোলকুন্ডার সুলতানের

একজন সাহসী কর্মচারী পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করে। মাটিতে পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত সে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যায়। চরম শত্রুরাও তার বীরত্বের প্রশংসায় মুখর হয়। শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তোলার পর মুঘল বাহিনীতে উচ্চপদে তাকে নিয়োগ করা হয়। গোলকুন্ডা জয় করে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(করার পর গোলকুন্ডার সুলতান আবুল হাসান বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা অবসর গ্রহণের ভাতা হিসেবে পান এবং দৌলতাবাদের দুর্গে নির্বাসিত হন।

বিজাপুর এবং গোলকুন্ডা অধিকার আওরঙ্গজেবকে মারাঠাদের সঙ্গে প্রত্য(সংঘর্ষে লিপ্ত করে এবং তিনি তাদের সম্পূর্ণভাবে ধবংসের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমদিকে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য পান। শম্ভুজীকে বন্দী করে হত্যা করা হয় ১৬৮৯ সালের মার্চ মাসে। শম্ভুজীর রাজধানী রায়গড় আত্র(মণের পর তাঁর পুত্র শাহু বন্দী হন। একসময়ে মনে হয় যে মারাঠাদের সমস্ত শক্তি(শেষ হয়ে গেছে। সুদূর দ(ণে আধিপত্যবিস্তার করে তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনোপল্লী'র হিন্দু শাসকদের কাছ থেকে সম্রাট অর্থ আদায় করেন। এভাবে ১৬৯৩ সালে আওরঙ্গজেব তাঁর (মতার শীর্ষে পৌঁছন। কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কা(্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধী(্বর ছিলেন তিনি। একুশটি প্রদেশ নিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য গঠিত হয় এবং সাম্রাজ্যের রাজস্ব ছিল ৩৩কোটি ২৫ ল(টাকা, আকবরের সময়ের ১৩ কোটি ২১ ল(টাকার তুলনায়। কিন্তু বাহুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না এবং এর পতন ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপে(া। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে আওরঙ্গজেব সব জয় করেন, প্রকৃতপ(তিনি সব হারান। এটি ছিল তাঁর ধ্বংসের সূচনা। তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখপূর্ণ এবং হতাশাব্যঞ্জক অধ্যায় শু(হয়। কেন্দ্রের থেকে একজন ব্যক্তি(র শাসন করার প(মুঘল সাম্রাজ্য অতিরিক্ত(বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সমস্ত শত্রুকে তিনি যদিও পরাজিত করেন কিন্তু চিরকালের মত তাদের ধ্বংস করতে পারেন নি। উত্তর ও মধ্যভারতের বহু জায়গায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। সুদূর দা(ণাত্যে থাকা বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর কর্মচারীদের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারান এবং প্রশাসন অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দা(ণাত্যে ত্র(মাগত যুদ্ধ তাঁর রাজকোষ শূন্য করে, প্রশাসন দেউলিয়া হয়ে যায়, দীর্ঘদিন বেতন না পাওয়া (ুধার্ত সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে স্পেনের (ত তাঁর পতন ঘটায়। দা(ণাত্যের (ত আওরঙ্গজেবকে ধ্বংস করে।

আওরঙ্গজেব যদিও মারাঠাদের কেন্দ্রীয় শক্তি(বিনষ্ট করেন, তিনি তাদের জাতীয়তাবোধের অবলুপ্তি ঘটাতে পারেন নি। এর ফলে শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় মুঘল সরকারের বি(দ্ধে জনগণের সংগ্রাম। শিবাজীর অপর পুত্র রাজারাম মারাঠাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হলেও কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসন ছিল না। প্রত্যেক মারাঠা নেতা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুঘল অধিকৃত অঞ্চল লুঠ এবং মুঘলদের বন্দী করে মুক্তি(পণ আদায় করতেন। এজন্য সমগ্র দা(ণাত্য জুড়েই সম্রাট শত্রুদের সম্মুখীন হন যাদের সঠিকভাবে চিহ্নি(ত ও দমন করা ছিল অসম্ভব। স্ট্যানলী লেনপুলের মতে এটি ছিল হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং জলকে আঘাত করা। যতদূর পর্যন্ত তাদের শিবির এবং শহর বিস্তৃত ছিল ততদূর পর্যন্তই মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে যাকে এবং অবশিষ্ট অংশ মারাঠাদের দখলে থাকে। সন্তাজী ঘোরপাড়ে এবং ধনাজী যাদব নামে দুজন মারাঠা নেতা মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে বিধ্বংসী আত্র(মণ চালান এবং তাদের সামরিক শিবির ধ্বংস করে দেন। সন্তাজীর নামেই মুঘল সৈন্যদের মধ্যে এমন ত্রাসের সঞ্চার হত যে তাঁর বি(দ্ধে প্রতিরোধে কোন সেনানায়ক রাজী হত না। সেজন্য মুঘল প্রদেশ থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করার জন্য রাজারামের তাঁর সেনাধ্য(দের প্রেরণ কিছুই বিস্ময়কর ছিল না। এই সংবাদ পাবার পর আওরঙ্গজেব জিঞ্জি দুর্গ আত্র(মণের আদেশ দেন। জুলফিকর খানের নেতৃত্বে ১৬৯১ সালে দুর্গ অবরোধ শু(হলেও দুর্গর(ীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য ১৬৯৮ সাল পর্যন্ত অবরোধ চলতে থাকে। দুর্গটি মুঘল বাহিনী অধিকার করার আগে, মারাঠা নেতা রাজারাম সাতারায় পালিয়ে গিয়ে একটি নতুন সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন।

এরপর স্বয়ং সম্রাটের তত্ত্বাবধানে মুঘল বাহিনী সাতারার দুর্গ অবরোধ করে ১৬৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও ১৭০০ সালের ১২ই মার্চ রাজারামের মৃত্যুতে মারাঠারা ভগ্নহৃদয়ে দুর্গ মুঘলদের হাতে সমর্পণ

করে। রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব নেন এবং মারাঠারা মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে বিধ্বংসী আত্র(মণ শু(করে। কাফী খান লিখেছেন যে তারাবাঈ মুঘল অঞ্চল আত্র(মণের যথেষ্ট প্রস্তুতি নেন এবং সিরোঞ্জ, মান্দাসোর, মালব পর্যন্ত ছয়টি সুবা লুঠ করার জন্য তিনি মারাঠা বাহিনী পাঠান। তারাবাঈ তাঁর সৈন্যদের হৃদয় জয় করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের সংগ্রাম, পরিকল্পনা, অভিযোগ, অবরোধ সত্ত্বেও মারাঠাদের শক্তি(ত্র(মাগত বাড়তেই থাকে।

আওরঙ্গজেব মারাঠাদের বি(দ্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের যুদ্ধ চালিয়ে অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করেন। তাঁর পার্লি, পান্হালা, কোন্ডালা, খেলনা, রাজগড়, তোর্ণা, ওয়াজিনজেরা জয় মারাঠাদের হতোদ্যম করতে পারে নি এবং তারা মুঘল প্রদেশগুলির বি(দ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যায়। কোন দুর্গ দখলই চিরস্থায়ী হয় নি কারণ দুর্গগুলি হারানোর পর মারাঠারা সেগুলি পুন(দ্ধার করে। এর ফল ছিল মুঘলদের সঙ্গে মারাঠাদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ যাতে মুঘলদের চরম (তি হলেও মারাঠারা নিরাপদেই থাকে। যদি একজন উদ্যমী মুঘল সেনানায়কের কাছে মারাঠারা পরাজিত হত তাহলে তারা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে গিয়ে পরে মুঘলদের বি(দ্ধে জয়লাভ করত, হেরে যাওয়া অঞ্চলের অর্থ ও সম্পদ লুঠ করে সেই অঞ্চলগুলি থেকে চৌথ আদায় করত। মারাঠা লুঠতরাজের এই সমস্যা এত ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে ১৭০৩ সালে তারা বেরাহ, ১৭০৬ সালে গুজরাট এবং বরোদা লুঠ করে। একসময় ১৭০৬ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে মারাঠা সৈন্য আহম্মদনগরে সম্রাটের শিবির আত্র(মণ করে এবং এক দীর্ঘস্থায়ী রক্ত((য়ী যুদ্ধের পর তাদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়। মারাঠা আত্র(মণে পরিশ্রান্ত আওরঙ্গজেবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং ১৭০৬ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অত্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করার প(ে তিনি যথেষ্ট বৃদ্ধ ছিলেন এবং নিজের ছেলেদের অবিশ্বাস করায় তাদের সঙ্গে শাসনকার্য ভাগ করে নিতে তিনি চাননি। এতে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি কখনোই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করতে পারেননি। তাঁকে শীর্ণ এবং মৃত প্রায় দেখাত। তাঁর সমস্যার প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা না থাকলেও আওরঙ্গজেব নিয়মিতভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করতেন। ১৭০৭ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

দা(ণাত্যে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের প(ে কোনভাবেই লাভজনক হয় নি এবং ধনসম্পদ ও সাম্রাজ্যের মত তাঁর শরীর ও মনেরও (য় হয়। দীর্ঘ বঞ্চনা এবং কষ্টের ফলে তাঁর সৈন্যরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। মারাঠাদের লুঠতরাজের জন্য পথঘাট নিরাপদ ছিল না। ১৭০২ সাল থেকে ১৭০৪ সালের মধ্যে অনাবৃষ্টির জন্য প্লেগ দেখা দেয়। খিদে ও অসুখে কয়েকল(লোকের মৃত্যু হয়। আওরঙ্গজেব এই দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না এবং যথেষ্ট ব্যথিত, হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। পুত্র আজমকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি এজন্য আ(প করেন। আওরঙ্গ জেবের দা(ণাত্য নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ না থাকলেও একজন কঠোর পরিশ্রমী শাসক এমন শোচনীয়ভাবে বিফল হলেন কেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।

ডঃ স্মিথের মতে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা জয় আওরঙ্গজেবের হঠকারিতা ছিল কারণ এতে কর্মহীন সৈন্যরা লুঠতরাজ করতে থাকে এবং মারাঠা নেতারা স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভয় থেকে মুক্তি(পায়। এই মতের বিরোধিতা করে স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন যে পতনোন্মুখ মুসলমান প্রদেশগুলির প(ে নবজাগ্রত, উৎসাহ, উদ্যমে পরিপূর্ণ এবং জাতীয়তার আদর্শে সংগঠিত মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব ছিল। ভারতে দেড়শ বছরের মুঘল শাসনের দ(ণ সৈন্যেরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল ও কর্ম(মতা হারিয়েছিল। তারা আরামপ্রিয় ও (-থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুঘলদের সামরিক ত্রুটি সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব নিজেই নিজের শত্রু ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র শত্রুর জন্ম দিয়েছিলেন, মিত্রের সৃষ্টি করতে পারেননি। শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা না করেই তিনি তাদের ধ্বংস করেন। এভাবে তিনি শত্রু তৈরী করেন এবং বন্ধুদের হারান। শুধুমাত্র মারাঠারা নয়, সব উপজাতি ও সম্প্রদায় তাঁর প্রতি বি(ব্ধ হয়ে ওঠে। সফলভাবে তাদের দমন করলেও তার এই নীতির সীমাবদ্ধতা বুঝতে ব্যর্থ হন আওরঙ্গজেব। যদি মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি(করে আওরঙ্গজেব তাঁর রাজধানীতে ফিরে যেতেন তাহলে হয়ত তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকত। তাঁর অদূরদর্শী নীতি ভাঙনের প্রবণতাকে শক্তি(শালী করে এবং তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের অ(মতা ও ব্যাভিচারের জন্য সাম্রাজ্যের ভাঙন দ্রুততর হয়।

একক ৬ ❑ জায়গীরদারী সমস্যা

৬.০ জায়গীরদারী সমস্যা

৬.১ কৃষক বিদ্রোহ

৬.০ জায়গীরদারী সমস্যা

জায়গীরদারী সংকটের ভিত্তি ছিল প্রশাসনিক এবং সামাজিক। জায়গীরদারী ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করত সরকার দ্বারা নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য রাখা এবং নিজের আশা ও অভ্যেস অনুযায়ী বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিজস্ব জায়গীর থেকে সংগ্রহ করার (মতার উপর। জায়গীরদারী ব্যবস্থায় জায়গীর হিসেবে প্রদত্ত অঞ্চলে জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করায় জায়গীরদারদের কায়েমী স্বার্থ ছিল। এর ফলে নির্ধারিত রাজস্ব ও আদায়ীকৃত রাজস্বের মধ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদানের বাস্তবতার উপর শুধু নয় বরং ফৌজদারদের সাহায্য নিয়ে জমিদারদের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করায় জায়গীরদের (মতার উপর নির্ভর করত। এই জমিদাররা সশস্ত্র ছিল এবং জমির অধিকারী কৃষকদের সঙ্গে জাতিগত এবং বংশগতভাবে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত(ছিল।

এভাবে দেশে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে জায়গীরদারী ব্যবস্থা গঠিত হয়। বিভিন্ন কারণের জন্য একমাত্র প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা ছাড়া উত্তর ভারতের অধিকাংশ জমিদার নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের (ে ত্রে মুঘলদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হয়। প্রকৃতপ(ত্র(মশ বেশীরভাগ জমিদারকেই পেশকাশ প্রদানকারী থেকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারীতে পরিণত করা হয় ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে। তখনও মনসবদারদের খুব দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, উদ্ভূত সম্পদ এবং বেতন হিসেবে মনসবদারদের দাবীর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় কারণ তখনও স্থানীয় জমিদারদের নিয়ন্ত্রণের জন্য মনসবদাররা ফৌজদারদের উপর নির্ভরশীল ছিল।

দা(িণাত্য, যেখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল এবং যেখানে ত্র(মাগত যুদ্ধ চলতে থাকায় স্থানীয় জমিদাররা এর সুযোগ নেয়, সেখানে এই ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের মূল ভিত্তি রচনা করে।

দা(িণাত্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভীম সেন মনসবদার ও ফৌজদারদের সামরিক শক্তি(র দুর্বলতা সম্পর্কে বলেছেন যে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে অধিকাংশ মনসবদারই একহাজারের বেশী সৈন্য রাখতে পারতেন না। ভীমসেনের বক্ত(ব্য অনুসারে প্রতিটি জেলাতেই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি(রা ফৌজদারদের অগ্রাহ্য করে নিজেদের শক্তি(বাড়িয়ে তোলে। এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং অভিযান পরিচালনার ব্যয়ের কথা ভেবে ফৌজদারেরা একজায়গায় বসে থেকেই শত্রু মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি(করে। তাঁর লেখা অনুসারে সাতহাজারী মনসবদাররাও মাত্র সাতশ সৈন্য রাখতে স(ম হয় এবং ফৌজদারদের অ(মতার জন্য এবং রাজপুত্র ও তাদের পুত্রদের ভবঘুরের মত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় ফৌজদারদের মত।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিস্থিতি আরো খারাপ করে দেয়। সবচেয়ে বেশী সম্পদ উৎপাদনকারী (সৈর হাসিল) জাগীর যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সাম্রাজ্যের খাস জমি হিসেবে সংর(িত করে রাখা হয়। পরিণতিস্বরূপ যেসব স্থানে জমিদারদের অতিরিক্ত(শক্তি(ও জমির অধিকারী কৃষকদের (মতার জন্য ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ অপে(াকৃত কঠিন ছিল, সেসব জায়গায় জায়গীরদারদের জায়গীর দেওয়া হয়। সাধারণত এসব অঞ্চল প্রাচীন বিজাপুর ও গোলকুন্ডার প্রান্তে ছিল। জায়গীরদাররা দাগের জন্য সরকার নির্দিষ্ট সংখ্যায় সৈন্যরা আবারও ঘোড়া পেশ করতে ব্যর্থ হলে তাদের

জায়গীরদারী বাজেয়াপ্ত হত এবং পাইবকী বা বিলি করার উপযোগী জমির অন্তর্ভুক্ত(করা হত।

সৈর-হাসিল জায়গীরের জন্য সংঘর্ষ মনসবদারদের কাছে জীবন-মরণের সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায় এবং মুৎসুদ্দিদের জায়গীরদের দ্রুত স্থানান্তরিত করার মত দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের সুযোগ করে দেয়। এর বি(দ্ধে ভীমসেন তীব্র অভিযোগ করেছেন। এর ফলে (ুদ্র মনসবদারদের সবচেয়ে বেশী (তি হয়।

জায়গীরদারী ব্যবস্থার ত্র(মবর্ধমান অকর্মণ্যতা যথেষ্ট সংখ্যায় জায়গীরের অভাবের জন্য বৃদ্ধি পায়। কাফী খান বলেছেন যে দান করার মত পাইবকী জমির অভাবে এবং অগণিত মনসবদার, বিশেষ করে এবং দ(ি ণী ও মারাঠী মনসবদারদের সংখ্যা বাড়ায় প্রাচীন অভিজাতদের পুত্র বা খানজাদরা প্রায় চার-পাঁচ বছর জায়গীর লাভ করতে স(ম হয় নি। ১৬৯১-৯২ সালে এটি ঘটে। জায়গীরদারদের সংখ্যা যাতে সাম্রাজ্যের সম্পদের চেয়ে বেশী না হয়ে যায় সেজন্য আওরঙ্গজেব নতুন অভিজাতদের নিয়োগ বন্ধ করে দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। বারংবার তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর নতুন কর্মচারীর প্রয়োজন নেই এবং নবনিযুক্ত(দের কোন তালিকা বা মিসল তাঁর কাছে না দেবার ইচ্ছে ব্যক্ত(করেন। কাফী খান বলেছেন যে এর ফলে তাঁর শিবিরে এবং যারা বহু বছর নিয়োগের জন্য অপে(া করেছিল তাঁদের মধ্যে আ(প দেখা যায়।

(ুদ্র মনসবদারদের ঘন ঘন স্থানান্তরন এবং জায়গীর পাবার আগে নতুন জায়গীরদারের কর্মচারীর কাছে অর্থ দাবী করা, জানানো জায়গীর পাবার আগেই সম্রাটের পশুদের র(ণাবে(ণের জন্য অর্থের দাবী এই ব্যবস্থার গু(ত্বপূর্ণ দোষ ছিল। খানজাদরা বা যারা বহু প্রজন্ম ধরে সাম্রাজ্যের সেবা করেছে এবং যাদের আনুগত্য ও সমর্থন সম্রাটের কাছে মূল্যবান ছিল তাদের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হওয়ায় এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রাচীন অভিজাতদের এতে আনুগত্য নষ্ট হয় এবং যখন এই ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়, অভিজাতরা তখন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগের সন্ধান করতে থাকেন।

দুটি দ(ি ণের রাজ্যজয় করার পর সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্ব ২৩% বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আকবরের সময় থেকে দা(ি ণাত্যের ভূমিরাজস্ব অতিরঞ্জিত করে দেখান হয়। সেজন্য অভিজাতরা নির্ধারিত রাজস্বের একটি ভগ্নাংশ পেতেন নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য। এর ফলে সম্পদের পূর্ণ সৈর জায়গীর পাবার জন্য তীব্র সংঘর্ষ দেখা যায়। পরবর্তী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে কোন অজুহাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে পাইবকী জমি হিসেবে রাখা হলেও প্রকৃত কারণ ছিল যুদ্ধের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধের জন্য অভিজাতদের কোন উৎসাহ ছিল না এবং যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা সকলেই বুঝতে অ(ম হয়।

আওরঙ্গজেবের সময়ে মনসবদারদের সংখ্যা ঠিক কত বৃদ্ধি পায় সেসম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা সঠিক নয়। আসার আলী দেখিয়েছেন যে একহাজার বা তার বেশী জাটের অধিকারী মনসবদারদের সংখ্যা মাত্র ৩১% বাড়ে। এটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনকে আওরঙ্গজেব দ(তার সঙ্গেই পরিচালনা করতেন। কিন্তু তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নীতির দ্বারা তিনি প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করেন। এছাড়াও নবোদ্ভূত প্রশাসনিক ও সামরিক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি কোন নতুন পদ(প গ্রহণ করেন নি।

জায়গীরদারী সমস্যা ত্র(মবর্ধমান সামাজিক, প্রশাসনিক ও সামরিক সমস্যার অংশ ছিল। রাজনৈতিক (ে ত্রে আওরঙ্গজেবের নমনীয়তার অভাব, তাঁর ঔদ্ধত্য ও সন্দেহপূর্ণ স্বভাব এবং রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য সামরিক শক্তি(র উপর অতিরিক্ত(নির্ভরতার ফলে দা(ি ণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ অলাভজনক যুদ্ধ চলতেই থাকে, যা জায়গীরদারী সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

কিন্তু এ ঘটনা সত্ত্বেও আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না যে আওরঙ্গজেবের শাসনে জায়গীরদারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন যথেষ্ট শক্তি(শালী ছিল। দা(ি ণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলে অত্যন্ত কৌশলী ও দ্রুতগামী মারাঠাদের বি(দ্ধে ব্যর্থ হলেও উত্তরভারতের সমভূমিতে মুঘল গোলন্দাজবাহিনী ও

অ্শ্বারোহী সৈন্যরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর যখন শত্তি(ও দ(তার দিক থেকে মুঘল গোলন্দাজবাহিনী যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে তখনও উন্মুত্ত(প্রান্তরে তাদের বি(দ্ধে মারাঠারা ব্যর্থ হত। ত্র(মবর্ধমান অরাজকতা, যুদ্ধ ও মারাঠাদের লুঠতরাজ দা(ণাত্যে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এবং শিল্প ও কৃষি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপত্র(ম হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, উত্তর ভারতে মুঘল প্রশাসন নিজের শত্তি(অ(ন্ন রাখে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকে। পরবর্তী সময় পর্যন্ত জেলাস্তরে স্থানীয় প্রশাসন টিকে থাকে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যেই রাজপুতরা মুঘলদের প(কোন সমস্যা ছিল না। তা সত্ত্বেও জায়গীরদারী সমস্যা অভিজাতদের মধ্যে এক কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে যা মুঘল সাম্রাজ্যের প((তিকর প্রমাণিত হয়।

৬.১ কৃষিসংত্র(ান্ত সমস্যা- জাঠ, সৎনামী, আফগান এবং শিখদের বিদ্রোহ ঃ

কৃষক বিদ্রোহ ঃ উপজাতীয় নেতৃত্বের অথবা গ্রামীন গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণের বি(দ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ, মুঘল শাসনের এক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল। প্রায়শই প্রতিরোধকে প্রায়শই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়। একই ভাবে উপজাতীয় বা গোষ্ঠী নেতাদের ও গ্রামীণ সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীকে প্রশাসনিক ও কর আদায়ের কাজে নিযুত্ত(করার জন্য উপঢৌকন, বিশেষ অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এভাবে দমন-নিপীড়ন এবং সন্ধিস্থাপনের প্রচেষ্টা একই সঙ্গে সবসময়ে চলতে থাকে। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের কৃষকবিদ্রোহের নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল তীব্র বিদ্রোহী মানসিকতা, প্রতিরোধ ও স্থানীয় ভূম্যধিকারী বা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা গঠিত উন্নততর সংগঠন।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিদ্রোহগুলিকে আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতির বি(দ্ধে হিন্দুদের প্রতিত্রি(য়া ও ত্র(মবর্ধমান আর্থিক শোষণের বি(দ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বর্ণনার প্রবণতা দেখা যায়। এসব গণসংগ্রামগুলিতে ধর্ম ও আর্থিক শোষনের গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তাসত্ত্বেও সমস্যাগুলির প্রকৃত কারণ বোঝার ((ত্রে এই ধারণা কোন সাহায্য করে না। মধ্যযুগে প্রচলিত ব্যবস্থার বি(দ্ধে প্রায় প্রতিটি সংগ্রাম ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ও ধর্মীয় বাণীর আশ্রয় নেয়—এটি অবশ্যই মনে রাখা উচিত। জাঠ ও শিখদের বিদ্রোহের ফলে ভিন্ন আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং একাজে শিখদের আগেই জাঠরা সফল হয়। একটি আলাদা উপজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের জন্য আফগানদের সংগ্রাম ধ্বংস করা হয়। পরবর্তীকালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি আফগান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। এভাবে বহু কৃষক বিদ্রোহেরই স্থানীয় কারণ ছিল।

জাঠ বিদ্রোহ ঃ যমুনার দুই তীরে বসবাসকারী জাঠেদের উপজাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ধারণা ছিল খুব গভীর, যার পরিচয় পাওয়া তাদের উপজাতীয় সংগঠনে। এই সংগঠন থেকে ছাপ (Chhaap) গড়ে ওঠে, যেটি উপজাতীয় সভার মত হলেও তাতে শ্রেণীবিন্যাস ছিল। দোয়াব ও যমুনার তীরবর্তী সমভূমিতে মাত্র কয়েকজন জমিদারের অধীনে কৃষক ছিল জাঠেরা। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র মুঘল এই কৃষকসম্প্রদায়ের জীবনযাপনে সমস্যার সৃষ্টি করে যারা এই অবিচারের প্রতিবাদে অস্ত্রধারণে উদ্যোগী হয়। এভাবে জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের শাসনকালে জাঠদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সংঘর্ষের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের শাসনে প্রথম একটি বিস্তৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ দেখা যায়। ১৬৬৭ সালের প্রথমে গোকলা নামে একজন (দ্র জমিদারের নেতৃত্বে মথুরার জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পা(র্শ্ববর্তী গ্রামের কৃষকরা যোগ দিলে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০,০০০ হয়ে দাঁড়ায় এবং বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছরের শেষদিকে জাঠদের ত্র(মবর্ধমান লুঠতরাজের জন্য আওরঙ্গজেব দিল্লী থেকে আগ্রায় চলে যান। এক কঠিন সংগ্রামে পরাজয়ের পর গোকলাকে বন্দী করা হয়। নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যার পর তাঁর পুত্রকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং সম্রাটের একজন উচ্চপদাধিকারী ত্র(ীতদাসের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়।

জাঠেদের সংগ্রামে কৃষকবিদ্রোহের সব বৈশিষ্ট্যই ছিল। এই সংঘর্ষে ধর্মের প্রায় কোন ভূমিকাই ছিল না।

সৎনামী বিদ্রোহ ঃ ১৬৭২ সালে মথুরার কাছে নারৌলে কৃষকদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সশস্ত্র যুদ্ধ হয়। এসময়ে সৎনামী নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয়। সৎনামীরা ছিল বৈরাগীদের একটি দল যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং ধর্মীয় আচার ও কুসংস্কারে বিরোধী। তাদের কর্তৃত্ব ও ধনসম্পদের প্রতি ঘৃণা এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিল কৃষক, কারিগর ও নীচুজাতির মানুষ। একজন সমসাময়িক লেখক স্বর্ণকার, ছুতোর, জমাদার, চর্মকার এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে যুক্ত হিসেবে তাদের উল্লেখ করেছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ ও পদাধিকারের পার্থক্য তারা মানত না এবং তাদের নিজস্ব আচরণবিধি ছিল। একজন স্থানীয় কর্মচারীর সঙ্গে বিরোধকে কেন্দ্র করে, এটি শীঘ্রই একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহের চরিত্র নেয়।

সৎনামীরা বহু গ্রামে লুঠ করে এবং স্থানীয় ফৌজদারকে পরাজিত করার পর নারৌল ও বৈরাট শহরের দখল নেয়। সেজন্য আওরঙ্গজেব ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠান, রদন্দাজ খান, রাজা বিষাণ সিংহ ও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে। তীব্র সংগ্রাম করা সত্ত্বেও এই বিশাল ও সুসংগঠিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে জাঠদের মধ্যে বাড়তে থাকা অসন্তোষ ভূমিরাজস্ব দেওয়া বন্ধের রূপ নেয়। ১৬৮১ সালে প্রতিশোধ হিসেবে আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ফৌজদার মুলাফত খান জাঠদের গ্রাম সিনসানী দখল করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিনসানীর জমিদার, রাজারাম ঐ অঞ্চলের জাঠদের সংগঠিত করার পর তাদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আগ্রার সঙ্গে বুরহানপুর ও আজমীরের সংযোগরক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ রাজপথে জাঠদের লুঠতরাজ শুরু হয়। এখন এই সংগ্রামের চরিত্রে সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা দেয়। ঐ অঞ্চল থেকে জাঠ ব্যতীত অন্য জাতের জমিদারদের বহিষ্কার এবং জাঠশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে জাঠরা। এভাবে জমিদারীর অধিকারকে কেন্দ্র করে জাঠ ও রাজপুতদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। রাজস্ব সংগ্রহকারী বেশীরভাগ জমিদার ছিল রাজপুত এবং কৃষকদের অধিকাংশই ছিল জাঠ। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কচ্ছ রাজপুত শাসক রাজা বিষাণ সিংহকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আহ্বান করেন আওরঙ্গজেব। জাঠরা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ১৬৯১ সালে রাজারাম ও তাঁর উত্তরাধিকারী চূড়ামণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। জাঠ কৃষকদের অসন্তোষ বাড়তে থাকায় তাদের লুঠতরাজ দিল্লী-আগ্রার পথকে পর্যটকদের পক্ষে বিপদসংকুল করে তোলে। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘলদের গৃহযুদ্ধ ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে চূড়ামণ একটি পৃথক জাঠ প্রদেশ গড়ে তোলেন। কৃষকবিদ্রোহ হিসেবে যেটি শুরু হয় পরে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং জাঠ নেতাদের শাসিত একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

আফগান বিদ্রোহ ঃ মুঘল ইতিহাসে পাঞ্জাব ও কাবুলের অধিবাসী আফগান উপজাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষ কোন নতুন ঘটনা ছিল না। আওরঙ্গজেবের শাসনে ১৬৬৭ সালে মুহম্মদ শাহের নেতৃত্বে থাকা মুঘলদের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্য ইউসুফজাই উপজাতির নেতার ভাগু বিদ্রোহ শুরু করে। রৌশনারী নামে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনের কঠোর নৈতিকতাপূর্ণ জীবন ও একজন পীরের প্রতি নিষ্ঠার-শিক্ষা এই আন্দোলনের চিন্তাগত পটভূমি তৈরী করে।

এই সংগ্রাম বন্ধ করা গেলেও ১৬৭২ সালে দ্বিতীয়বার আফগান বিদ্রোহ দেখা দেয়। আফ্রিদি নেতা আকমল খান মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আফগানদের আহ্বান জানায়। অবশেষে মুঘল বাহিনী তাকে পরাজিত করে।

১৬৭৪ সালে সুজাত খান নামে একজন উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারী খাইবার অঞ্চলে আফগান আক্রমণের সম্মুখীন হন। রাজপুত নেতা যশবন্ত সিংহ তাঁকে রক্ষা করেন। অবশেষে ১৬৭৪ সালের মাঝামাঝি আওরঙ্গজেব নিজে পেশোয়ারে যান এবং ১৬৭৫ সালের শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকেন। শক্তি ও কূটনীতির দ্বারা আফগানদের মধ্যেকার ঐক্য ধ্বংসের পর শান্তি স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে উপজাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কাবুলের শাসনকর্তা, আমীর খাঁ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আফগান বিদ্রোহে মুঘল শাসনের বি(দ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আকাঙ(া শুধুমাত্র হিন্দু কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আফগান বিদ্রোহ এক বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ সময়ে শিবাজীর উপর মুঘলদের আত্র(মণের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে।

শিখ বিদ্রোহ ঃ মুঘলদের শিখ জনগণের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়। গু(নানকের প্রেরণায় পাঞ্জাবে একটি একে(শ্বরবাদী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন শিখদের মধ্যে এক নতুন স্বাধীন চেতনার জন্ম দেয়। নানকের উত্তরাধিকারী শিখগু(দের সঙ্গে আকবরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও বিদ্রোহী রাজপুত্র খস(কে সাহায্য করায় শিখগু(অর্জনের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিরোধ শু(হয়। কিন্তু এর ফলে শিখদের উপর অত্যাচার করা হয়নি। অল্প সময়ের জন্য গু(হরগোবিন্দকে বন্দী করে রাখা ছাড়া শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। শাজাহানের শাসনের প্রথমদিকে মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে গু(হরগোবিন্দ সিংহের কয়েক বার সংঘর্ষ হয়। শিখ আন্দোলনের উদ্ভবের মধ্যেই এই বিরোধের কারণ নিহিত ছিল। ডঃ আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে এই সংঘর্ষ হয় অতি তুচ্ছ কারণকে কেন্দ্র করে। পাঞ্জাবে গু(র প্রতি নিষ্ঠাবান, একটি নির্দিষ্ট জাতিগত ও ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সমস্ত রকম অবিচারের প্রতিবাদ করতে দৃঢ়সংকল্প একটি (দ্র অথচ ত্র(মবর্ধমান সম্প্রদায়ের উত্থানে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে অনুগতদের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য মসন্দদের নিয়োগ, গু(রামদাসের কনিষ্ঠ পুত্র অর্জনের ১৫৮১ সালে নির্বাচনের ফলে বংশানুত্র(মিক দ্বারা প্রচলনের ফলে শিখ গু(বাদের চরিত্রে পরিবর্তন এবং অর্জনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক (মতার স্মারক হিসেবে দু'টি তরবারী বহন সংঘাতের আরও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। একজন পাঠান ও মুঘলদের প্রতি অসন্তুষ্ট বহু ব্যক্তি(শিখগু(র সঙ্গে যোগ দেয়। শিখ গু(দের ত্র(মবর্ধমান (মতা সম্পর্কে সচেতন হবার পর তাদের প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে মুঘল সম্রাটরা সচেষ্ট হন।

শিখ গু(দের (ে ত্রে আওরঙ্গজেবেরও একই সমস্যা ছিল। যার জন্য ১৬৭৫ সালে গু(তেগবাহাদুরকে দিল্লীতে বন্দী করে হত্যা করা হয়। এটি ছিল স্থানীয় গণ-বিদ্রোহের সঙ্গে মুঘলদের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন মুঘলরা শিখ গু(কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখে তখন শিখদের কাছে তিনি ছিলেন শোষণের বি(দ্ধে সংগ্রামকারী একজন ধর্মীয় নেতা।

১৬৯৯ সালে আনন্দপুরে গু(গোবিন্দ সিংহ খালসা নামে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে গু(গোবিন্দ সিংহের সংঘর্ষের সূচনা হয়। মুঘলদের আত্র(মণের বি(দ্ধে বিজয়ী না হলেও তিনি একটি ঐতিহ্য এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র গঠনের অস্ত্র দিয়ে যান শিখদের। একটি সাম্যবাদী ধর্মীয় আন্দোলন কিভাবে গণসংগ্রামে পরিণতি লাভ করে ও আঞ্চলিক স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয় শিখদের বিদ্রোহ ছিল তার দৃষ্টান্ত।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি ঃ

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অভিজাতদের মধ্যে দলাদলি, মুঘল সম্রাটের (মতা ও সম্মানহানি জায়গীর ব্যবস্থার চরম সংকট এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রদেশের উত্থান দেখা দেয়, যেগুলি হয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছে, নয়তো মুঘলদের অমান্য করে স্রেফ প্রতীকি আনুগত্য স্বীকারে রাজী আছে। সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে মারাঠারা কয়েকটি আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে তোলে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৭৬১ সালে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে এই প্রচেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করে। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর আত্র(মণ বৈদেশিক অভিযানের জন্য সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে উন্মুক্ত(করে দেয়। ১৭৪৮ সালে মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর মুঘল রাষ্ট্র আগেকার মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়ায় পরিণত হলেও আঞ্চলিক শক্তি(গুলি মুঘল শক্তি(নামমাত্র আনুগত্য দেখাতে থাকে।

একক ৭ ❑ মুঘল সমাজ ও অর্থনীতি

গঠন

৭.০ মুঘলদের সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন
৭.১ শাসক সম্প্রদায়—অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী
৭.২ মধ্যবর্তী শ্রেণী
৭.৩ কৃষকদের অবস্থা
৭.৪ অকৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন
৭.৫ রপ্তানী বাণিজ্য ও মুঘল বন্দর

৭.০ মুঘলদের সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরম সীমায় পৌঁছয়। এই সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক (ে ত্রে বহু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দেয়। আকবরের শাসন থেকে সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু এসময়ে গু(ত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখা যায়, গ্রামের জীবনযাপনের মান নির্ধারণের জন্য যাদের বি(-ষণ প্রয়োজনীয়। ওইসময়ে বহু ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটক ভারতে আসেন এবং ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। সাধারণত ভারতের ধনসম্পদ, প্রাচুর্য, শাসকশ্রেণীর বিলাসবহুল জীবন এবং কৃষক, কারিগর, শ্রমিকদের মত সাধারণ মানুষের ত্র(মবর্ধমান দারিদ্র্যের উপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। সাধারণ মানুষদের স্বল্প বেশভূষা দেখে বাবর অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁর মতে কৃষক ও সাধারণ মানুষ প্রায় নগ্নভাবে থাকত। তারপর তিনি লজ্জানিবারণের জন্য পরা কটিবস্ত্রের এবং নারীদের পরিধেয় শাড়ীর বর্ণনা দিয়েছেন। ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ তাঁর বক্ত(ব্যকে সঠিক প্রমাণ করে। ষোড়শ শতকের শেষে র‍্যালফ ফিচ লিখেছেন যে বারাণসীতে শুধু কটিবস্ত্র ছাড়া মানুষ প্রায় নগ্নভাবে চলাফেরা করত। অন্য একজন পর্যটকের বক্ত(ব্য হল যে শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট বস্ত্র শ্রমিকদের ছিল না। র‍্যালফ ফিচের মতে ভারতের শীতকাল পাশ্চাত্য দেশের গরমকালের মত, যেসময়ে সাধারণ মানুষ মোটা সূতীর পোষাক ও টুপি পরত। একই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে চটি বা জুতোর ব্যবহার সম্পর্কে। নীকিটিনের পর্যবে(ণ অনুযায়ী দা(িণাত্যে মানুষ খালিপায়ে চলাফেরা করত। মোরল্যান্ড নামে একজন আধুনিক লেখক বাংলা ছাড়া নর্মদার উত্তরে জুতোর সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাননি এবং এর কারণ হিসেবে চর্মের অতিরিক্ত(দামের কথা বলেছেন। গৃহ ও আসবাবপত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলার নেই। শহরের মাটীর বাড়ির সঙ্গে গ্রামের বাড়ির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সাধারণ মানুষের খাট ও মাদুর ব্যতীত অন্য আসবাব এবং গ্রামের কুমোরের তৈরী বাসনপত্র ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তামা ও অন্য মিশ্রধাতুর থালা ও বাসন ছিল ব্যয়সাধ্য এবং গরীব মানুষরা সাধারণত সেগুলি ব্যবহার করত না। ভাত, জোয়ার, রাগী, বাজরা, ডাল এবং পেলসার্ট ও ডি লায়েৎ যাকে খিচুড়ী বলেছেন সেটি প্রধান খাদ্য ছিল এবং বাংলায় ও উপকূল অঞ্চলে মাছ ও সুদূর দ(িণ ভারতে মাংস খাওয়া হত। উত্তর ভারতে গম বা অন্য খাদ্যশস্য থেকে প্রস্তুত চাপাটী, ডাল ও সব্জি প্রচলিত খাদ্য ছিল। সাধারণ মানুষ রাত্রেই তাদের প্রধান খাবার এবং দিনে ডাল বা অন্য মুড়িজাতীয় খাবার খেত। খাদ্যশস্যর তুলনায় তেল ঘি অনেক সস্তা ছিল এবং সাধারণ মানুষের খাদ্যের এক প্রধান অঙ্গ ছিল। চিনি ও নুনের দাম ছিল বেশী। কাজেই অতিরিক্ত(মূল্যের জন্য জামাকাপড় ও জুতো ব্যবহার না করতে পারলেও মানুষ মোটামুটি ভাল খাবার খেতে পারত।

যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি সহজলভ্য হওয়ায় বেশীসংখ্যক পশুপালন করে তারা বেশী দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য পেত। প্রকৃতপ(আয় ও বেতনের উপর জীবনযাপনের মান নির্ভর করত। গ্রামে আর্থিক লেনদেনের (ে ত্রে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন না থাকায় আর্থিক মূল্যের বিচারে বহুসংখ্যক কৃষকের আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। প্রথা অনুযায়ী স্থির করা সামগ্রী দিয়ে গ্রামীণ কারিগরদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হত। গড়ে প্রতিটি কৃষকের ব্যক্তি(গত জমির পরিমাপ করা ছিল অসম্ভব। প্রাপ্ত তথ্য থেকে গ্রামে যথেষ্ট আর্থিক অসাম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব কৃষকের নিজস্ব লাঙ্গল ও বলদ ছিল না এবং যারা জমিদার বা উচ্চবর্ণের লোকেদের জমি চাষ করত তারা কোনভাবে বেঁচে থাকত। ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকরা অধিকাংশ (ে ত্রেই অস্পৃশ্যশ্রেণীর লোক ছিল। দুর্ভি(দেখা দিলে এই শ্রেণীর মানুষদেরই চরম কষ্ট ভোগ করতে হত।

যেসব চাষীদের নিজস্ব জমি ছিল তাদের খুদকস্ত বলা হত। গ্রামীণ প্রথা অনুযায়ী স্থির করা হারে তারা ভূমিরাজস্ব দিত। তাদের অনেকের অনেক লাঙ্গল ও বলদ থাকায় তারা গরীব চাষীদের সেগুলি ব্যবহার করতে দিত এবং ভূমিহীন কৃষকদের অতিরিক্ত(হারে রাজস্ব দিতে হত। এভাবে গ্রামীণ সমাজে যথেষ্ট অসাম্য ছিল। খুদকস্তরা, যারা গ্রামের আদি বসবাসকারী ছিল, তারা অনেকসময়ে গ্রামের প্রতিপত্তিশালী বিশেষ কোন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত(ছিল। এই জাতিগুলি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারই শুধু নয়, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীদের শোষণও করত। আবার পরিবর্তে জমিদারদের দ্বারা তারা শোষিত হত। গণনার পর দেখা গেছে যে সপ্তদশ শতকের সূচনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২ কোটী ৫০ ল(। তা সত্ত্বেও কৃষিযোগ্য বহু জমি পড়ে থাকায় মনে করা যেতে পারে যে সামাজিক নিয়মকানুন মেনে যতটুকু জমি নিজেদের সামর্থ্য ও পারিবারিক পরিস্থিতি অনুযায়ী চাষ করা সম্ভব, চাষীরা ততটাই চাষ করত। এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনীতি ছিল বহুমুখী। ভারতে গম, চাল, ছোলা, বার্লি, ডাল, বাজরা প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং স্থানীয় কৃষিজ শিল্পের প্রয়োজনীয় বহু ফসলের চাষ হত। এগুলির মধ্যে তুলো, নীল, চৈ, আখ, তৈলবীজ গু(ত্বপূর্ণ ছিল। এসব ফসলের জন্য নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব দিতে হওয়ায় এগুলিকে নগদ বা উন্নততর ফসল অ্যাখ্যা দেওয়া হত। দামের বৃদ্ধি ও হ্রাসের উপর নির্ভর করে চাষীরা শুধুমাত্র বিভিন্ন ফসল চাষ করতনা, নতুন ধরনের শস্য চাষেও তারা আগ্রহী ছিল যদি সেটি লাভজনক হত। সপ্তদশ শতকে দুটি নতুন ফসল—তামাক ও ভুট্টার চাষ শু(হয়। ওইসময় বাংলায় সিল্ক ও তসরের উৎপাদন এত বেড়ে যায় যে চীন থেকে সিল্ক আমদানী করার প্রয়োজন ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলু ও লাল লঙ্কার চাষ শু(হয়। সপ্তদশ শতকে শহরের ত্র(মবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাদ্যের যোগান দিতে গ্রামীণ উৎপাদন সমর্থ হয়। ওইসময়ে ভারত থেকে কিছু প্রতিবেশী দেশে খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হত। শিল্পের বিস্তার, বিশেষত বস্ত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান দিতে কৃষি উৎপাদন সমর্থ হয়। মুঘল রাষ্ট্র কৃষির বিস্তার ও উন্নতির উদ্দেশ্যে কৃষকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা ও কৃষিঋণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু স্থানীয় প্রচেষ্টা ও মূলধন বিনিয়োগ ছাড়া কৃষির বিস্তার ও উন্নতি অসম্ভব ছিল। এজন্য বলা যায় যে ভারতীয় কৃষকরা সর্বদা র(ণশীল ও পরিবর্তনবিমুখ ছিল না। কৃষি(ত্রে নতুন উৎপাদনব্যবস্থার প্রচলন না হলেও ভারতীয় কৃষিতে ভারসাম্য থাকায় সেটি ত্র(মবর্ধমান শিল্পউৎপাদন ব্যবস্থায় গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। মধ্যযুগে যতদিন পর্যন্ত সে রাজস্ব দিত, সেটি ততদিন পর্যন্ত কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করা যেত না। গোষ্ঠীর অনুমতি অনুসারে এবং উপযুক্ত(ত্রে(তা খুঁজে পেলে সে নিজের জমি বিত্রি(করতেও পারত। কৃষকের মৃত্যুর পর জমির উত্তরাধিকারী হত তার সন্তানরা। ভূমিরাজস্বের হার খুব বেশী, মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক হলেও কৃষির উন্নতি ও বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগের অধিকার কৃষকদের ছিল। কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন কষ্টকর হলেও সে যথেষ্ট পরিমাণে খেতে এবং জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারত। তার জীবন ধারনের ধরণ নির্ভর করত কিছুটা ঋতু, এবং কিছুটা লোকাচারের উপর— যেখানে মেলা, তীর্থযাত্রা, পার্বণ ইত্যাদির যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাদের জীবনে ভূমিহীন কৃষক, কারিগর ও শ্রমিকদের একটি অংশের জীবন ছিল অনেক বেশী কষ্টকর। শহরের একটি বড় অংশ দরিদ্র কারিগর, ত্র(ীতদাস, সৈন্য ও খেটে খাওয়া মজুদরদের নিয়ে গঠিত ছিল।

ইউরোপীয় পর্যটকদের বক্তব্য অনুসারে অত্যন্ত নিম্নস্তরের এক ভৃত্যের মাসিক বেতন পাঁচ টাকার কম ছিল। অধিকাংশ শ্রমিক ও সৈন্যরা প্রথম কাজে যোগ দিত মাসে তিন টাকার বিনিময়ে। মোরল্যান্ড লিখেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে কর্মচারীদের বেতন বিশেষ না বাড়ায় তারা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পেলেও তাদের পক্ষে বস্ত্র, চিনি কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এ থেকে মোরল্যান্ড সিদ্ধান্ত করেন যে বৃটিশ শাসনে ভারতীয়দের অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটেনি। কিন্তু এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি দেখা উচিত। সপ্তদশ শতকে যেখানে সম্পদ ও আয় বিশেষ বাড়েনি, সেখানে বৃটিশ শাসিত ভারতে উদ্যমশীলতার অভাব এবং জীবনযাপনের মানের অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

৭.১ শাসক-সম্প্রদায়—অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী ঃ

মধ্যযুগে ভারতে শাসক সম্প্রদায় গঠন করে অভিজাতরা ও জমির মালিকেরা বা ভূস্বামীরা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুঘল অভিজাতরা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল। কাগজেকলমে মুঘল অভিজাত হবার পথ ছিল সবার জন্য খোলা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বা বিদেশী অভিজাতবংশজাত ব্যক্তিদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত। ইরান, খোরাস্তান, তুরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বেশীরভাগ মুঘল অভিজাতদের নিয়োগ করা হত। বাবর তুর্কী হওয়া সত্ত্বেও মুঘলরা কখনোই জাতিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করে নি। প্রসিদ্ধ আফগান অভিজাতদের বাবর নিজের দিকে টানার চেষ্টা করলেও তারা অশান্ত, বিশ্বাসের অযোগ্য ও আনুগত্যহীন প্রমাণিত হয়। আকবরের শাসন পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে মুঘল ও আফগানদের মধ্যে সংঘর্ষ চললেও জাহাঙ্গীরের সময় থেকে অভিজাত হিসেবে আফগানদের নিয়োগ শুরু হয়। শেখজাদা বা হিন্দুস্তানী নামে পরিচিত ভারতীয় মুসলমানদের নিয়মিত নিয়োগ করা হত। আকবরের সময় থেকে রাজপুতরাও মুঘল অভিজাতদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের মধ্যে কচ্ছ রাজপুতরা বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। কিছু গবেষকের হিসেব অনুসারে আকবরের শাসনে ১৫৯৪ সালে অভিজাতদের মধ্যে ১৬% ছিল হিন্দু। কিন্তু এই সংখ্যা থেকে হিন্দুদের অবস্থান ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়না। রাজা মানসিংহ ও রাজা বীরবল আকবরের বন্ধু ও অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন এবং রাজস্বের ক্ষেত্রে রাজা টোডরমলের যথেষ্ট মতা ও সম্মান ছিল। অভিজাত হিসেবে নিযুক্ত রাজপুতরা সাধারণত বংশানুক্রমিকভাব রাজা, অভিজাত বংশ ও রাজার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবার থেকে আসত। এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের পারিবারিক আভিজাত্যের গৌরব বাড়ে। তা সত্ত্বেও সাধারণ পরিবার থেকে আসা মানুষদের অভিজাত হিসেবে পদোন্নতি ও খ্যাতিবৃদ্ধির সুযোগ ছিল। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের শাসনে অভিজাতদের মধ্যে স্থিতিশীলতা দেখা দেয়। উভয় সম্রাটই মনসবদারী ব্যবস্থার দ্বারা অভিজাতদের সুসংহত করা, নিয়মানুযায়ী পদোন্নতি, শৃঙ্খলা এবং রাজকীয় কার্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। অন্য কোন দেশের তুলনায় মুঘল অভিজাতদের বেতন ছিল অত্যন্ত বেশী। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটদের উদারতা এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি মুঘল রাজদরবারে আসেন। এর ফলে অন্যান্য দেশ থেকে ভারতে প্রতিভার নিগর্মন দেখা দেয়। ভারতে মুঘল রাজসভায় কাজের সন্ধানে ইরানী, তুরানী ও অন্যান্যদের আগমন সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার মন্তব্য করেছেন যে, মুঘল অভিজাতবর্গ গঠিত ছিল বিদেশীদের নিয়ে। বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি ভারতে আসতে থাকেন, মুঘল রাজসভায় কাজের মাধ্যমে খ্যাতিলাভ করেন এবং ভারতেই তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হয়। এভাবে মধ্যযুগে ভারতে অতীতের মতই বহু বিদেশীর আগমন ঘটে, যারা ভারতীয় সমাজের, যারা একে অপরকে এখানে আকর্ষণ করেছেন। অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের নিজস্ব কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন। এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের শাসনে অভিজাতদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। একই সঙ্গে মুঘল অভিজাতদের মধ্যে আফগান, ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসময়ে হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে একটি নতুন

গোষ্ঠী ছিল মারাঠারা। দা(িণাত্যে মারাঠাদের গু(ত্ব সম্পর্কে সচেতন জাহাঙ্গীর তাদের প্রথম নিজের প(ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। শা-জাহান এই নীতি বজায় রাখেন। যেসব মারাঠা সর্দাররা শাজাহানের অধীনে নিযুক্ত(হন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিবাজীর পিতা শাহজী, যদিও শীঘ্রই তিনি দলত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেবও বহু মারাঠা ও দ(িণী মুসলমানদের নিয়োগ করেন। এটি ল(্য করা উচিত যে, শাজাহানের শাসনে অভিজাতদের ২৪% হিন্দুরা গঠন করলেও, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয় ভাগে অভিজাতদের ৩৩% ছিল হিন্দু এবং তাদের সংখ্যা দেড়গুণ বেড়ে যায়। হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিলেন মারাঠী।

মুঘল অভিজাতরা অত্যধিক বেতন পেলেও তাদের খরচও ছিল যথেষ্ট বেশী। প্রত্যেক অভিজাতের ভৃত্য ও অনুচরবর্গ এবং বহু অ(ে ও হস্তীর আস্তাবল এবং বিভিন্ন ধরনের যান থাকত। তখনকার দিনে আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ একজন ব্যক্তি(র সমৃদ্ধির পরিচায়ক হিসেবে অভিজাতদের অনেকে বহু নারীকে হারেমে রাখতেন। অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপনের (ে ত্রে অভিজাতরা মুঘল সম্রাটদের অনুকরণ করতেন। প্রবাহিত জলধারা ও ফলের গাছে পূর্ণ বাগানবাড়ীতে তাঁরা থাকতেন। অত্যন্ত দামী পোষাক এবং সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। একটি বিবরণ অনুসারে প্রত্যেকবার খাবার সময়ে আকবরের জন্য প্রায় ৪০টি পদ প্রস্তুত করা হত। সুবিধাভোগী শ্রেণীরা সমরখন্দ ও বোখারা থেকে উৎকৃষ্ট মানের ফল আনার জন্য প্রচুর খরচ করতেন। নরনারীদের ব্যবহৃত অলঙ্কার ছিল মূল্যবান সামগ্রীর অন্যতম। পু(ষদের মধ্যে রত্নখচিত কর্ণভূষণ ব্যবহারের প্রচলন করেন জাহাঙ্গীর। বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যয়নির্বাহের জন্য ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে গয়না ব্যবহার করা হত। মুঘল সম্রাটকে বাধ্যতামূলকভাবে দেয় উপঢৌকন ছিল ব্যয়ের একটি (ে ত্র। এটি মনে রাখতে হবে যে দেয় উপহারের মূল্য একজনের ব্যক্তি(গত সম্পদের উপর নির্ভর করে স্থির করা হত। মুঘল সম্রাটের কাছ থেকেও প্রতিদানে অভিজাতরা উপহার পেতেন।

যদিও সঞ্চয়ের পরিবর্তে ব্যয়ই মধ্যযুগে শাসকশ্রেণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এবং অল্প সংখ্যক ধনী ব্যক্তি(ই ঋণভার থেকে মুক্ত(থাকতেন এবং নিজেদের সন্তানদের বিশাল সম্পত্তি দান করতেন, পরো(বা প্রত্য(ভাবে অর্থনীতির অগ্রগতিতে অভিজাতরা সাহায্য করেন। সম্রাটের উপহার দেওয়া জমি কিনে যেখানে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান, সেখানে তাঁরা ফলের বাগান ও বাজার স্থাপন করেন যাতে সেগুলির ভাড়া এবং বেচাকেনার দ্বারা তাঁদের আয় বাড়ে। তাঁরা ব্যবসায়ীদের সুদে টাকা ধার দিতেন ও ব্যবসায়ীদের নামে বা তাদের সঙ্গে একযোগে ব্যবসায় অংশ নিতেন। তাঁর লেখার একটি বিশেষ অংশে আবুল ফজল অভিজাতদের লাভজনক বাণিজ্যে ও ব্যবসায় কিছু অর্থ বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। মুসলমানদের আইন অনুসারে সুদে টাকা ধার দেওয়া ঘৃণ্য হলেও, আবুল ফজল অভিজাতদের সুদের বিনিময়ে অর্থ বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত না হতে বলেছেন, যা সমসাময়িক মূল্যবোধের পরিচায়ক। ঐ সময়ের বাণিজ্যিক বিনিয়োগে নিয়োজিত অভিজাতদের সঠিক অংশ নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন। কখনো রাজপুত্ররা বা অভিজাতরা (মতার অপব্যবহার করে কিছু বিশেষ পণ্যের ত্র(য়বিত্র(য় নিয়ন্ত্রণ করত এবং স্বল্প মূল্যে নিজেদের সামগ্রী ও শ্রম বিত্র(ীতে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের বাধ্য করত। কিন্তু সেগুলি কারিগরদের দ্বারা পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার মত গু(ত্বপূর্ণ ছিল না। রাজপুত্র, রাজকন্যা, হারেমের মহিলা প্রমুখ রাজপরিবারের সদস্যদের অনেকসময় নিজস্ব জাহাজ থাকত এবং তারা সেই সব জাহাজে পণ্য পরিবহণ করে ভাড়া হিসেবে অর্থ আদায় করত। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের একজন অভিজাত মীরজুমলার পারস্য, আরব ও দ(িণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যাপক হারে বাণিজ্যের জন্য নিজস্ব নৌবাহিনী ছিল। অর্থ ও বাণিজ্যের প্রতি লোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে আওরঙ্গজেবের মুখ্য কাজীও বাণিজ্যে অংশ নেন, যা তিনি সম্রাটের কাছে লুকোতে চেষ্টা করেন। এভাবে মুঘল অভিজাতদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও চিত্রশিল্পী, গায়ক, যন্ত্রবাদক, পারসী ও হিন্দী কবি, বিদ্বান ব্যক্তি(দের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে অভিজাতরা একটি মিশ্র সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সফল হয়। জমিই আয়ের মূল উৎস হওয়ায়, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের হলেও ত্র(মশ আমলাতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে দেখা যায়।

এভাবে মুঘল রাষ্ট্র ও শাসকশ্রেণী ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রতিফলিত করে। এই আর্থিক অগ্রগতি ভারতবর্ষকে ধনতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারত কিনা তা বলা কঠিন হলেও ভারতে আর্থিক উন্নতি কতটা ঘটে এবং এই পরিবর্তনের চরিত্র অনুসন্ধানই আমাদের চিন্তার মুখ্য বিষয়। সপ্তদশ শতকে অভিজাতদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত, জায়গীরদারী ব্যবস্থার সংকটের ফলে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে অভিজাতদের কর্মদ(তার অবনতি ঘটে ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়।

জমিদার ও গ্রামীণ ভূস্বামী সম্প্রদায়

আবুল ফজল এবং সমসাময়িক লেখকদের রচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে ভারতে জমির উপর ব্যক্তি(গত অধিকার ছিল অতি প্রাচীন। উত্তরাধিকারের উপর জমির স্বত্ত্ব নির্ভর করত। কিন্তু সব সময়ে জমিতে নতুন মালিকানারও সৃষ্টি হত। ঐতিহ্য অনুসারে যে কোন জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসত, সেই জমির মালিকানা পেত। সেসময়ে ভারতে প্রচুর কৃষিযোগ্য জমি সহজলভ্য ছিল। একদল উদ্যমী ব্যক্তি(দের প(নতুন গ্রাম স্থাপন করা বা পতিত জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা কঠিন ছিল না। ওই কৃষিযোগ্য জমির তারা মালিক হতে পারত এবং কয়েকটি গ্রাম থেকে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার বংশানুক্র(মে কয়েকজন জমিদার ভোগ করত। এই অঞ্চলকে তার খাস তালুক বা জমিদারী বলা হত। কেন্দ্রীয় শক্তি(র হয়ে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের বিনিময়ে জমিদাররা কিছু অঞ্চলে রাজস্বের ২৫% পর্যন্ত পেতে পারত। নিজের জমিদারীর সমস্ত জমির মালিক জমিদার ছিল না। নিয়মিতভাবে ভূমি রাজস্ব দিলে তাদের চাষ করা জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করা যেত না। এভাবে জমির উপর জমিদার ও কৃষক উভয়েরই বংশানুক্র(মিক অধিকার ছিল। জমিদারদের উপরে ছিল স্থানীয় রাজারা ছোটবড় নানা (দ্র অঞ্চলে তারা বিভিন্ন স্তরের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। পারস্যদেশীয় লেখকরা কেন্দ্রীয় (মতার অধীন হিসেবে দেখানোর জন্য তাদের জমিদার আখ্যা দিলেও, ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী জমিদারদের থেকে রাজাদের স্থান ছিল উপরে। এভাবে গ্রামীণ সমাজসহ মধ্যযুগীয় সমাজ খন্ডিত এবং বহু স্তরে বিন্যস্ত ছিল। জমিদারদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তারা তাদের সমৃদ্ধির ও আশ্রয়ের প্রতীক হিসেবে গড় বা ছোট দুর্গে বাস করত। জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনী ছিল যথেষ্ট শক্তি(শালী। আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অনুসারে আকবরের সময়ে জমিদারদের ৪২, ৭৭, ০৫৭ পদাতিক ও ৩, ৮৪, ৫৫৮ অ(ারোহী, ১৮৬৩ হস্তী, এবং ৪২৬০টি কামান ছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকায় থাকায় জমিদাররা কখনোই একই স্থানে তাদের সৈন্য একত্রিত করতে পারত না। অধীনস্থ রাজাদের সৈন্যরাও হয়ত এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত(ছিল। তাদের জমিদারীতে বসবাসকারী কৃষকদের সঙ্গে জাতি, বংশ বা উপজাতীয় ভিত্তিতে জমিদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জমির উৎপাদন(মতা সম্পর্কে তাদের কাছে যথেষ্ট স্থানীয় তথ্য থাকত। সমগ্র দেশ জুড়ে দেশমুখ, পাতিল, নায়ক নামে পরিচিত জমিদাররা একটি যথেষ্ট শক্তি(শালী শ্রেণী ছিল। সেজন্য কোন কেন্দ্রীয় শক্তি(র প(তাদের প্রতি উদাসীন থাকা বা তাদের বিরাগভাজন হওয়া সহজ ছিল না।

জমিদারদের জীবনযাপনের মান সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। অভিজাতদের তুলনায় তাদের আয় ছিল সীমিত। (দ্র জমিদাররা কৃষকদের মত করেই জীবন কাটাত। বড় জমিদারদের জীবনধারণের মান (দ্র রাজা বা অভিজাতদের মতই ছিল। অধিকাংশ জমিদার গ্রামে বাস করত এবং তারা একটি ঢিলেঢালা গ্রামীণ ভূস্বামী সম্প্রদায় গঠন করেছিল। জমিদাদেরা শুধুমাত্র জমির অধিকার দখলের জন্য সংঘাতে লিপ্ত থাকতেন ও নিজেদের এলাকায় কৃষকদের অত্যাচার করতেন—এই ধারণাটি যথাযথ নয়। নিজস্ব জমিদারীতে জমির মালিক কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতি ও বংশগত দিক থেকে জমিদারদের অনেকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একটি সামাজিক জীবনের শুধু মান নির্দিষ্ট করা নয়, এই জমিদাররা নতুন গ্রাম স্থাপন, কৃষির বিস্তার ও উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ ও প্রয়োজনীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতেন।

৭.২ মধ্যবর্তী শ্রেণী

মধ্যযুগে ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ার বলেছেন যে ভারতে কোন মধ্যবর্তী শ্রেণী ছিল না, মানুষ হয় প্রচুর ধনসম্পদ বা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। কিন্তু এই বক্তব্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত বলতে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের বোঝালে ভারতে বিশালসংখ্যক বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিল এবং তাদের কয়েকজন সেসময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ঐতিহ্য এবং জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষার নীতির উপর ভিত্তি করে এইসব ব্যবসায়ীরা নিজস্ব অধিকার ভোগ করত। কিন্তু শহরের প্রশাসন পরিচালনার কোন দায়িত্ব তাদের ছিল না। ইউরোপে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে বণিকরা এধরনের অধিকার অর্জন করে। ফ্রান্স ও বৃটেনে যখন শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তখন এইসব অধিকার খর্ব করার প্রবণতা দেখা দেয়। যদি মধ্যবর্তী শ্রেণী বলতে এমন শ্রেণীকে বোঝায় যাদের জীবনযাত্রার মান ধনী ও দরিদ্রদের জীবনযাপনের মানের মধ্যবর্তী, তাহলে মধ্যযুগের ভারতে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী ছিল। এদের মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র মনসবদার, দোকানদার, দক্ষ কারিগরদের এক ক্ষুদ্র অংশ এবং হাকিম, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, ঐতিহাসিক, কাজী, উলেমাদের মত পেশাদারী শ্রেণী। মুঘল প্রশাসনে নিযুক্ত সাধারণ কর্মচারীও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ত। যেখানে সাধারণ কর্মচারীদের নগদ বেতন দেওয়া হত ও দুর্নীতির পথে তারা তাদের আয় বাড়াত, সেখানে বিদ্বজ্জন, উলেমাদের পারিশ্রমিক হিসেবে অল্প জমি দেওয়া হত। এই দান করা জমিকে মুঘল প্রশাসনের ভাষায় মাদাদ-ই-মাস এবং রাজস্থানে সামান বলা হত। মুঘল সম্রাট ব্যতীত অভিজাত, স্থানীয় শাসক ও জমিদাররা এভাবে জমি দান করতেন। এই দানগুলির জন্য প্রত্যেক নতুন শাসকের অনুমতি আবশ্যক হলেও ক্রমশ সেগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। প্রদত্ত জমির অধিকারীরা গ্রামীণ ভূস্বামী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা গ্রাম ও শহরের মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা করে। লেখক, ঐতিহাসিক ও উলেমারা একই শ্রেণীভুক্ত ছিল। বিভিন্ন অংশের স্বার্থ পৃথক হওয়ায় মধ্যবর্তী ব্যক্তিরা কোন নিজস্ব শ্রেণী গঠন করেনি। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও জাতি থেকে তারা আসত।

৭.৩ কৃষকদের অবস্থা

বর্তমানের মতই মুঘল যুগে ভারত প্রধানত কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল এবং জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশের বেশী মানুষ গ্রামে বাস করত। ড. এ. এন. শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে মানুষ ও পণ্যে পরিপূর্ণ এই দেশ কৃষিযোগ্য ও পশুচারণের উপযুক্ত জমি এবং জ্বালানীসংগ্রহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার্য অরণ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত বহু গ্রামে বিভক্ত ছিল। বসবাসের চরিত্র অনুযায়ী গ্রামগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হত। কিন্তু গ্রামের অধিবাসীরা স্থান পরিবর্তন করত না এবং পরিত্যক্ত গ্রামের জমি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দ্বারা অধিকৃত হলে সেই গ্রামকে দাখিলি বলা হত। তালুক ও রায়তি হিসেবেও গ্রাম ভাগ করা থাকত। রায়তি গ্রামে নিজের চাষ করা জমির মালিকানা কৃষক ভোগ করত এবং রাষ্ট্র সরাসরি তার কাছ থেকে রাজস্ব নিত। নিজের অধীনস্থ তালুক গ্রাম থেকে জমিদার ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করত।

কৃষকদের চাষের পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় জলসেচের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে নদী, জলধারা, কূপ ও জলসেচের জন্য ভারতে কাটা কোন খাল ছিল না। তাঁর বর্ণনা অনুসারে কূপের কাছে থাকা কাঠের কপিকলের সাহায্যে বালতি করে জল তোলা হত। একজন লোক বলদদের চালনা করত, অন্যজন জল তুলত। বলদদের মল-মূত্র লেগে দড়িটি নোংরা হয়ে যাবার পরও সেটি কুয়োয় ফেলা হত। কিছু ফসলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল পুরুষ ও মহিলারা কলসী করে বয়ে নিয়ে যেত। এভাবে ফসল প্রধানত বৃষ্টির উপরে

নির্ভরশীল ছিল। অনাবৃষ্টি ঘটলে অত্যন্ত অল্প শস্য উৎপাদনের ফলে কিছু অঞ্চলে দুর্ভি(দেখা দিত। দুর্ভি(র সময়ে কৃষক ও গ্রামের অন্যান্য মানুষদের চরম দুর্দশা ভোগ করতে হত।

'আকবরের মৃত্যুর সময়ের ভারতবর্ষ' বইয়ে মোরল্যান্ড লিখেছেন যে বৃটিশ শাসনের তুলনায় মুঘলদের অধীনে ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমিকদের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। প্রধানত দুটি কারণে শ্রমিকেরা খাদ্যের সন্ধানে শহরে চলে যেতে পারতনা। সেসময়ে শহরে বড় শিল্প না থাকায় কাজের সুযোগ কম ছিল এবং দ্বিতীয়ত শ্রমিকরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে প্রয়োজনমত তাদের শ্রম পাওয়া যাবে না ভেবে জমিদাররা শ্রমিকদের শহরে যেতে দিত না। মোরল্যান্ড আরও উল্লেখ করেছেন যে স্বাভাবিক সময়েও কৃষকদের বস্ত্র, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের জন্য যথেষ্ট অর্থ ছিল না এবং কখনো কখনো তাদের খাদ্যাভাব দেখা দিত। যখন প্রতিকূল আবহাওয়ায় স্বাভাবিক পরিমান ফসলের উৎপাদন হত না তখন কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উভয়েরই অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হত। দুর্ভি(, যুদ্ধবিদ্রোহের মত দুর্যোগ তাদের কষ্টকে বাড়িয়ে তুলত এবং অবস্থার আরও অবনতি ঘটাত। জাহাঙ্গীরের সময়ে বিদেশী পর্যটক ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট লিখেছেন যে সাধারণ মানুষ এমন চরম দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে বাস করত যে তাদের জীবন অভাব-অনটনের মূর্ত প্রতীক ছিল। পেলসার্ট মোরল্যান্ডের বক্ত(ব্য মুঘল শাসনে কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ ছিল না। তাকে সমর্থন করেছেন। ডঃ দত্ত লিখেছেন যে শাজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অত্যাচারে কৃষকরা বিপন্ন বোধ করত এবং অনেকে ভি(া করার পথ বেছে নিত।

মুঘল শাসনে কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল—মোরল্যান্ডের এই বক্ত(ব্যের বি(দ্ধে বহু ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রতিবাদ করেছেন। ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের যুক্তি(ছিল যে আকবরের সময়ে কৃষকদের জীবনে দুর্দশার কোন প্রমাণ নেই এবং একমাত্র দুর্ভি(র সময় ছাড়া অন্য সময়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাব দেখা দিত না। তারা চাঁদ লিখেছেন যে মুঘল শাসনে নিজস্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী চাষ করা সম্ভব এমন মাপের জমিই সকলের থাকত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে জমি টুকরো টুকরো করে ভাগ করা হয়নি এবং অলাভজনক জমির সমস্যা সৃষ্টি হয় নি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল আমলে কৃষকের জমির আয়তনই শুধু বড় ছিল না, তার ফলনশীলতাও উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরসূরীদের থেকে অনেক বেশি ছিল। মোরল্যান্ডের বক্ত(ব্যকে জাফর এবং ইরফান হাবিবও অস্বীকার করেছেন (History of the Freedom Movement in India –Vol. I Page – 185 Some Culural Aspects of Muslim Rule in India- S.M. Jaffar Chapter II Economic Conditions The Agrarian System of Mughal India– Irfan Hahib).

প্রাচীনকালের ও স্বাধীনতার পূর্বের অবস্থা থেকে মুঘল যুগে গ্রামীণ জীবন কিছুমাত্র পৃথক ছিল না। কুয়োসমেত কয়েকটি মাটীর বাড়ী ও মাটীর কাঁচা পথ নিয়ে এক একটি গ্রাম যেন সবুজ প্রান্তর ও গাছগাছালিতে ঘেরা এক একটি দ্বীপ। মুঘল সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের যাই ঘটুক না কেন অধিকাংশ মানুষ পরিতৃপ্তভাবে, সুখ ও শান্তির সঙ্গে বাস করত। সাধারণ মানুষের চাহিদা ও গৃহের বিভিন্ন সামগ্রী ছিল খুবই কম। খড়ের চালযুক্ত(মাটীর বাড়ীতে স্বল্প বস্ত্র ও বাসনপত্র নিয়ে অধিকাংশ মানুষ বাস করত। প্রত্যেক গ্রামে কুমোর, ছুতোর, চর্মকার এবং খাবারের কিছু দোকান থাকায় গ্রামের মধ্যেই সকলের প্রয়োজন মিটত। সরল জীবন-যাপন করায় অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্যবান এবং প্রয়োজনীয় পরিশ্রম করার উপযুক্ত(হত। শিশুদের শি(াদানের জন্য মসজিদ ও মন্দিরের সংলগ্ন অঞ্চলে গাছের ছায়ায় বসে মৌলভী ও ব্রাহ্মণরা ছাত্রদের পড়াতেন। সাধারণভাবে অধিকাংশ সময়ে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করলেও বিবাহ, মেলা, উৎসব উপল(্যে মানুষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করত। এভাবে গ্রামীণ সমাজ প্রাচুর্য না হলেও পরিতৃপ্তির সঙ্গে শান্তিতে বাস করত। গ্রামের সব প্রয়োজন গ্রামের সীমানার মধ্যেই মিটে যাওয়ায় প্রতিটি গ্রাম পরস্পরবিচ্ছিন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চল ছিল।

প্রত্যেক সমাজে যেমন কিছু বিভাগ ও স্তরবিন্যাস থাকে তেমনই মধ্যযুগে গ্রামের সমাজেও আর্থিক, সামাজিক

ও ধর্মীয় বিচারে কিছু শ্রেণীবিভাগ ছিল। ডঃ ইরফান হাবিবের মতে আর্থিক (মতা ও অধিকারের ভিত্তিতে মুঘল গ্রামসমাজকে চার ভাগে ভাগ করা যেত। জমিদার, মহাজন, শস্য ব্যবসায়ীরা প্রথম শ্রেণীতে, ধনী কৃষকরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে, অধিকাংশ সাধারণ কৃষক তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ভূমিহীন শ্রমিক ও চামার নামে পরিচিত চর্মকার ও ধানক নামের আবর্জনা পরিষ্কারক অস্পৃশ্য জাতিরা চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল। কৃষক ও জমিদারদের বিস্তৃত জমিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই চতুর্থ শ্রেণীর মানুষরা চাষ করত এবং ফসল কাটার গু(ত্বপূর্ণ সময়ে কৃষক পরিবারকে এদের উপর নির্ভর করতে হত। কৃষি ব্যতীত যাদের অন্যকিছু জীবিকা ছিল তারাই এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারত। কাজেই চামার ও ধানক শ্রেণীর লোকেরাও কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করত। গ্রামে জাতিভেদপ্রথার যথেষ্ট প্রভাব থাকায় শ্রমভিত্তিক কাজ করা নিম্নজাতের মানুষেরা কৃষিকার্য করতে ও নিজেরা জমির মালিক হতে পারত না। এভাবে জমিদার ও এক বিশেষ জাতের কৃষকদের অধীনে তাদের প্রায় ত্রীতদাসের মত থাকতে হত। জাতিভেদের দ্বারা সৃষ্ট বংশানুত্র(মিক বিভেদ কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে শ্রমের এক অপরিবর্তনীয় বিভাজন করে দেয়। গ্রামের মধ্যে নাপিত, কাঠুরে কুমোর সকলের কাজই বিশেষ জাতির, অধিকাংশ ে(ত্রে একটি পরিবারের মধ্যে সীমিত ছিল। স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনেই প্রত্যেক গ্রামে কিছু প্রাথমিক শিল্প থাকত। গ্রামের জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশী অংশ জুড়ে ছিল কৃষকরা। সাধারণত একজাতের হলেও অন্য জাত বা মূল জাতের কোন শ্রেণী থেকে তারা আসত। কৃষির বাইরে কিছু ে(ত্রেও কৃষকরা একযোগে কাজ করত এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ছিল একযোগে কাজ করা। সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ যে কাজের ে(ত্রে গ্রামবাসীরা একত্রিত হত সেটি ছিল স্বৈরাচারী প্রশাসনের বি(দ্ধে প্রতিবাদ। আ(রিক অর্থে পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হলেও গ্রামে প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তি(কে নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হত, যেটিকে জনস্বার্থ সংত্র(ান্ত সকল বিষয় পরিচালনা করত। সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের ইচ্ছা অনুসারে গ্রামের মোড়ল সর্বদা কাজ করত। বিভিন্ন ব্যক্তি(দের মধ্যে তুচ্ছ কলহের মীমাংসা করত পঞ্চায়েত যার সিদ্ধান্ত মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল।

রাষ্ট্র বা প্রশাসনের সঙ্গে বিশেষ যোগ না থাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিতে গ্রামীণ কর্মচারী বেশীসংখ্যক না থাকলেও, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামপ্রধান সরকার ও গ্রামের মধ্যে যোগসূত্র র(া করত। গ্রামপ্রধান উত্তর ভারতে মুকদ্দম এবং দা(িণাত্যে পাতিল নামে পরিচিত ছিল। একটি গ্রামে একাধিক গ্রামপ্রধান থাকতে পারত এবং কয়েকটি গ্রামে একাধিক মোড়ল থাকার দৃষ্টান্ত আমরা পাই। সে নিজে সাধারণত একজন কৃষক হলেও কখনো কখনো গ্রামপ্রধানের পদ বহিরাগতদের দ্বারা ত্র(য়যোগ্য হওয়ায় শহরের অধিবাসী কোন ব্যক্তি(ও গ্রামের মোড়ল হতে পারত। নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ রাজস্বসংগ্রহের (মতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি(হলে গ্রামপ্রধানকে পদচ্যুত করে একজন নতুন গ্রামের মোড়ল নিয়োগ করার (মতা ভোগ করত। যেসব গ্রামে গ্রামসমাজের ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে সেসব গ্রামে মুকদ্দমদের শক্তি(বৃদ্ধি পায়।

মুকদ্দমের প্রধান কাজ ছিল ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করা যার পরিবর্তে সমগ্র সংগৃহীত রাজস্বের ২½% তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পেত। সাধারণত সন্দেহ করা হত যে নিজেদের হাতে ছেড়ে দিলে নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়াও দুর্বল চাষীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত(অর্থ সংগ্রহ করবে মুকদ্দমরা। যখন সরকার মুকদ্দমদের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দিত, তখন দালাল হিসেবে কিছু অর্থ পেত মুকদ্দমরা। কিছু প্রথানুযায়ী স্থির করা করও গ্রামবাসীদের থেকে তারা সংগ্রহ করত। গ্রামের উপর মুকদ্দমের শাসন(মতা শুধুমাত্র আর্থিক ছিল না, গ্রামে সংঘটিত যেকোন অপরাধের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হত। গ্রামের পাটোয়ারী বা হিসেবর(ক ছিল একজন গু(ত্বপূর্ণ কর্মচারী। সে গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখত। জমির মালিকানা ও সম্পত্তিসংত্র(ান্ত অন্য বিষয় সে নথিবদ্ধ করত। গ্রামসমাজের ভৃত্য হিসেবে তাদের স্বার্থে পাটোয়ারীরা কাজ করবে আশা করা হলেও সবসময়ে সেটি হত না।

শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে ডঃ তারা চাঁদের কয়েকটি পর্যবে(ণের উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে গ্রামগুলি তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী ছিল। প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তারা ছিল আত্মনির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র,

আসবাব প্রভৃতি সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যক্তি(গত ব্যবহারের জন্য তারা তৈরী করত। গ্রামের কৃষকরা খাদ্যশস্য, মশলা, তৈলবীজ, আখ, তুলো চাষ, কারিগররা কাঠ, পেতল, তামা, লোহার আসবাব, যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র তৈরী, শিল্পীরা কাপড় রং এবং চামড়ার সামগ্রী তৈরী করত ও বাড়ী বানাত। কৃষির পদ্ধতি এবং কুটীর শিল্পের যন্ত্রপাতি ছিল প্রাচীন। যন্ত্রের ব্যবহার জানা ছিল না। মানুষের দৈহিক শ্রম, ঘোড়া ও গবাদি পশুরা প্রয়োজনীয় শক্তি(র যোগান দিত। গ্রামে দ(কারিগরদের নিজেদেরই কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হত। একই গ্রামে প্রায় সমস্ত শস্যের উৎপাদন হত। নির্দিষ্ট জাতের বংশানুত্র(মিক কারিগররা প্রাচীন পরম্পরাগত পদ্ধতিতে শিল্পপণ্য উৎপাদন করত। প্রথাদ্বারা স্থির করা জিনিসের দাম ও কারিগরদের পারিশ্রমিক কিছু দ্রব্যের মাধ্যমে দেওয়া হত। মুদ্রার ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত না থাকায়, বিভিন্ন সামগ্রীর বেচাকেনা হত বিনিময় ও শ্রমদানের মাধ্যমে। জমি বহুদূর বিস্তৃত হলেও অধিকাংশ মানুষ স্থিতাবস্থাই পছন্দ করত। মানুষ পরিতৃপ্ত থাকায় পরিবর্তন ও অগ্রগতির কোন প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যেত না।

৭.৪ অকৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন

অধ্যাপক এস. এম. জাফরের বক্ত(ব্য অনুসারে, মুঘল শাসনে মানুষের জীবনের অন্যান্য সব (ে ত্রের মত শিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। ব্যক্তি(গত এবং সরকারী উদ্যোগে শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব কারখানা গড়ে তোলে এবং জনস্বার্থমূলক কার্যের জন্য সৃষ্ট বিশেষ বিভাগের উপর এগুলির দায়িত্ব দেয়। ডঃ ইবন হাসানের মতে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসেবে আকবর প্রতিদিন বিকেলে কারখানার কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। আবুল ফজল লিখেছেন যে শিল্প উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি জনসাধারণকে শেখানোর জন্য দ(প্রশি(ক ও কারিগর নিয়োগের (ে ত্রে আকবর যথেষ্ট দৃষ্টি দিতেন। লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আমেদাবাদের রাষ্ট্রীয় কারখানায় প্রচুর উৎকৃষ্টমানের পণ্য উৎপাদন করা হত। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধিমান কারিগরদের কর্মদ(তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দেশে প্রস্তুত সামগ্রীর মতই বিভিন্ন পণ্য মুঘল কারখানাগুলি উৎপন্ন করত। সাধারণভাবে সূক্ষ্ম জিনিসের চাহিদা বাড়তে থাকে। বার্ণিয়ারের বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেক মুঘল দুর্গেই কারখানার জন্য বিস্তৃত ক(থাকত। সূচীশিল্পের কারিগর, স্বর্ণকার, চিত্রশিল্পী, ছুতোর, যন্ত্রের শ্রমিক, দর্জি, চর্মকার, রেশম, ভেলভেট, মসলিনের বস্ত্রশিল্পীরা কারখানায় প্রশি(কদের তত্ত্বাবধানে কাজ করত। রেশম, ভেলভেট, মসলিন দিয়ে পাগড়ী, কটিবন্ধ, সুতোর কাজ করা মহিলাদের পোষাক তৈরী হত। শুধুমাত্র কারখানা স্থাপন নয়, শুধু উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নত মান বজায় রাখার দিকেও মুঘল সম্রাটদের দৃষ্টি ছিল। এজন্য কারখানার তত্ত্বাবধায়ককে প্রতি ছয়মাস অন্তর মুঘল সম্রাটকে প্রত্যেক কারখানার ব্যয় ও উৎপাদনের হিসেব দিতে হত। কখনো কখনো পণ্য প্রদর্শনের আদেশ দেবার পর সবচেয়ে সূক্ষ্ম দ্রব্যের কারিগরদের সম্রাট পুরস্কার দিতেন। এভাবে কারিগররা নিজস্ব শিল্পে বিশ্বের যে কোন দেশের কারিগরদের সমান পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বলা হয় যে যখন জাহাঙ্গীরকে স্যার টমাস রো একটি বৃটিশ চিত্র দিলে সম্রাট তাঁকে বলেন যে, রাজদরবারের একজন চিত্রশিল্পী ছবিটি হুবহু নকল করলে টমাস রো আসলটি চিনে নিতে অসমর্থ হবেন। এই বক্ত(ব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যখন আসল আর নকল রাজদূত অনেক কষ্টের পর চিনতে পারেন। শাজাহান মক্কায় ৫০,০০০ টাকার উপহার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে রাষ্ট্রীয় কারখানায় তৈরী পণ্য পবিত্র সেই তীর্থস্থানে বিত্র(ীর পর জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ দান করার নির্দেশ দেন।

শ্রমের বিশেষীকরণ এবং কাঁচামালের প্রাচুর্যের জন্য ব্যক্তি(গত উদ্যোগে শিল্পোৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বাবর লিখেছিলেন যে প্রত্যেক কারিগরই পু(ষানুত্র(মে কোন ব্যবসায় যোগ দিত। বার্ণিয়ারের বিবরণ অনুসারে স্বর্ণকারের পুত্র স্বর্ণকার হত এবং শহরে চিকিৎসকের পুত্র চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ত। পেলসার্টের মতে চাবাসপুর, সোনারগাঁ প্রভৃতি শহর যেখানে শিল্পের বিশেষীকরণ ঘটেছিল সেখানে বয়ন শিল্পই ছিল প্রায় সব মানুষের জীবিকা এবং বস্ত্রের উৎকৃষ্ট মানের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

সারা দেশ জুড়ে শিল্পপণ্য উৎপাদনের উন্নতির কারণ বি(-ষণ করেছেন স্যার যদুনাথ সরকার। তিনি লিখেছেন যে মুঘল সরকারের দ্বারা নিযুক্ত(না হওয়া কারিগররা রাষ্ট্রীয় কারখানায় দ(প্রশি(কদের কাছে যান্ত্রিক শি(ালাভের পর অভিজাত ও রাজাদের কাছে চাকরী পেত। এভাবে সারা দেশেই তাদের কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। দুর্ভাগ্যত্র(মে দ(তা ও শ্রম অনুযায়ী কারিগরদের সবসময়ে বেতন দিত না অভিজাতরা, যার ফলে শুধুমাত্র পারিশ্রমিক নয়, উৎকৃষ্ট মানের সামগ্রী তৈরীর অনুপ্রেরণা থেকেও বঞ্চিত হত তারা। বৃহৎ ও (দ্র শিল্পের অগ্রগতি বড় শহরগুলির বিস্তারের সহায়ক হয়। ১৫৮১ সালে মনসারেট লিখেছেন যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন শহরের তুলনায় লাহোর কোন অংশে কম ছিল না। ১৫৮৫ সালে র‍্যালফ ফিচের বক্ত(ব্য অনুসারে লন্ডনের তুলনায় আগ্রা ও ফতেপুর বেশী বড় ও জনবহুল ছিল। আগ্রা ও ফতেপুরের মধ্যে ১২ মাইল দূরত্বের সম্পূর্ণটা নিয়েই খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর বাজার গড়ে ওঠে।

মুঘলযুগের বিভিন্ন উন্নত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ছিল সূতীবস্ত্র বয়ন। প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকজন তাঁতী থাকত এবং দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানীর জন্য যথেষ্ট বস্ত্রের উৎপাদন হত। গুজরাটের পাটান, খান্দেশের বুরহানপুর, উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর ও বারাণসী, বিহারের পাটনা, পাঞ্জাবের লাহোর ও শিয়ালকোট, বাংলার সোনারগাঁ ও সাতগাঁ প্রভৃতি বস্ত্রবয়নের প্রধান কেন্দ্র সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। ডঃ দত্ত লিখেছেন যে ওড়িশা থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র দেশকে সূতীবস্ত্রের কারখানা মনে হত এবং উচ্চমানের অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের জন্য ঢাকার খ্যাতি ছিল। বার্ণিয়ার সূতী ও রেশমবস্ত্র উৎপাদনের (ে ত্রে মুঘল ভারতে শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী দেশে ও ইউরোপে বাংলার অদ্বিতীয় স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন।

সূতীবস্ত্রের অনুসারী শিল্প হিসেবে বস্ত্ররঞ্জন শিল্পের এমন অগ্রগতি ঘটে যে এদেশে প্রস্তুত বিভিন্ন রং দেখে এডওয়ার্ড টেরী বিস্মিত হন। আকবর রেশম শিল্পের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর সিত্রী ও গুজরাটে রেশমবয়ন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। জাহাঙ্গীর, শাজাহানও রেশম শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এতে রেশমের সামগ্রিক উৎপাদন বেড়ে প্রায় ২৫ ল(পাউন্ড হয়ে দাঁড়ায় যার মধ্যে মধ্য এশিয়ায় প্রায় ১০ ল(পাউন্ডের রেশম রপ্তানী করত ডাচ ও অন্যান্য বণিকরা। ডঃ এ. এল. শ্রীবাস্তবের মতে জাহাঙ্গীর অমৃতসরে উলের কার্পেট ও শালবয়নশিল্প গড়ে তোলেন। আগ্রা ও ফতেপুর সিত্রীতে সুন্দর কার্পেট তৈরী হত। পাঞ্জাবের শিয়ালকোট তাঁবু তৈরীর জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

সূতীবস্ত্র ছাড়া ধাতুশিল্প ছিল বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। বারাণসী, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, থাট্টা, ঔরঙ্গাবাদ এই শিল্পের গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা কাষ্ঠমণ্ড দিয়ে সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় কাগজ দেশে উৎপাদন করা হত। লাহোর, রাজগীর, অযোধ্যা এই শিল্পের গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। গালার খেলনা ও অলঙ্কারশিল্পের উন্নতি ঘটে গুজরাটের সুরাটে। সোনা-রূপোর উপর কাজের জন্য বিহার বিখ্যাত ছিল। পাথরে তৈরী জিনিসের জন্য খ্যাতি ছিল পাঞ্জাবের খোরীয়ার এবং জৌনপুর ও গুজরাটের সুগন্ধী তেল যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী হলেও সোমনাথের তরবারির বিশেষ খ্যাতি ছিল। কামানের গোলা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় শোরা বিহার ও দা(ণাত্যে উৎপাদন হত। ডঃ দত্তের মতে মুঘলযুগে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায় যে মুঘল সম্রাটদের শাসনে শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোই শুধু নয়, বিদেশে রপ্তানীর (ে ত্রেও শিল্পপণ্যের যথেষ্ট গু(ত্ব ছিল। এটি বিস্ময়কর নয় যে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের ভারসাম্য ভারতের প(সুবিধাজনক হয় এবং ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ভারতীয় পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়লে শিল্পের উন্নতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। স্যার যদুনাথ সরকার আ(প করেছেন যে এভাবে ভারতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, জাতীয় পণ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, যান্ত্রিক দ(তা ও সভ্যতার মান ত্র(মশ নিম্নমুখী হয় এবং দেশের মধ্যেকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে শিল্প-সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটে।

৭.৫ রপ্তানী বাণিজ্য ও মুঘল বন্দর

মুঘল ভারতে বাংলা ও গুজরাট সূতীবস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বস্ত্রবয়নশিল্প। ত্রে(তাদের একটি (দ্র অংশের চাহিদা পূরণ করায় রেশমশিল্পের অর্থনৈতিক গু(ত্ব তুলনামূলকভাবে কম ছিল। আবুল ফজল বলেছেন যে আকবর এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাশ্মীরে এক বিশেষ ধরনের রেশম উৎপন্ন হলেও বাংলা ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ট্যাভার্নিয়ের হিসেব অনুসারে বাংলায় প্রায় ২৫ ল(পাউন্ড মূল্যের রেশমের সূতীবস্ত্র বয়ন করা হত এবং গুজরাটের সুতো ও বাংলার মসলিনের উপর ভারতীয় সূতীবস্ত্রের খ্যাতি নির্ভর করত। লাহোর ও আগ্রা ছিল রেশমশিল্পের গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র। রাজধানীতে এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিলাসদ্রব্যের ভাল বাজার ছিল।

রেশমের মতই পশম ধনী ব্যক্তি(দের পোশাকের জন্য ব্যবহার করা হত। শালবয়নে কাশ্মীর বিশেষত্ব অর্জন করে। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় লাহোরে শাল বোনা শু(হয়। আগ্রা ও লাহোরের কার্পেট শিল্পকেও তিনি সহায়তা করেন। আবুল ফজল সাধারণ কম্বলের উল্লেখ করলেও সাধারণ মানুষ সেগুলি ব্যবহার করত না।

সারাদেশে সবচেয়ে বিস্তৃত শিল্প ছিল সূতীবস্ত্রবয়ন। অভ্যন্তরীণ বস্ত্রের বাজারে ভারতীয় তাঁতের আধিপত্য ছিল এবং এছাড়াও আরব ও তার আশেপাশে, বার্মা ও পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে এবং পূর্ব আফ্রিকার মত রপ্তানী বাণিজ্যের তিনটি প্রধান কেন্দ্রে ভারতীয় বস্ত্র পাঠান হত। সূতীবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি, সিন্ধের সমতলভূমিতে ক্যাম্বে, উপসাগরের তীরে, দা(ণাত্যে, করমন্ডল উপকূলে এবং বাংলায় ছড়িয়ে ছিল। বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কয়েকটি স্থান খ্যাতিলাভ করে। সূক্ষ্ম মসলিনবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা। ট্যাভার্ণিয়ের বক্ত(ব্য অনুসারে বাংলায় উৎপন্ন সূতী ও রেশমবস্ত্র মুঘল সাম্রাজ্যে শুধু নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ, এমনকি ইউরোপেও প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

সূতীবস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্ররঞ্জনশিল্পেরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। টেরীর বক্ত(ব্য অনুসারে অমসৃণ সূতীবস্ত্রের উপর নিঁখুতভাবে ফুল ও অন্যান্য আকারের নকশা এমনভাবে করা হত যে কোনভাবেই সেগুলি কাপড় থেকে উঠে যেত না।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জিনিসের পরিমান ও আঞ্চলিক বিস্তৃতির বিচারে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ত্র(মশ বাড়তে থাকে। ঐ সময়ে ভারতে আসা বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠীর ত্রি(য়াকলাপের ফলে পূর্বে যেসব অঞ্চলে বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েনি সেসব অঞ্চলেও ভারতীয় রপ্তানীর বিকাশ হয়। আরেকটি গু(ত্বপূর্ণ কারণ ছিল অটোমান সাম্রাজ্য, সাফাভীদ ও মুঘল সাম্রাজ্যের মত তিনটি গু(ত্বপূর্ণ এশিয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠা।

রপ্তানী বাণিজ্য ও মুঘল বন্দর ঃ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি শুধু নয়, এই সাম্রাজ্যগুলি নগরায়ণ ও মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের সহায়ক হয়। যেমন সাধারণত আশা করা যায় তেমনই বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথের উপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে এই সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ দেখা দেয়।

ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা ঃ ধনতন্ত্র বলতে মূলধনের প্রাধান্য বোঝায়। উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য থেকে অর্থ সঞ্চয় করে মূলধন একত্রিত করা হয়। প্রকৃতপ(, মুঘল ভারতে কৃষি উৎপাদনের মান সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিজাত ও অকৃষিজাত উভয় উৎপাদনের (ত্রেই বাজারের যথেষ্ট গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কৃষি(ত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কৃষিশ্রমিক নিয়োগের প্রচলন থাকায় ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবার প্রবণতা ল(্য করা যায়। কুটীর শিল্পে বণিকদের মূলধন বিনিয়োগ যথেষ্ট বাড়ে এবং তারা অগ্রিম অর্থ প্রদানের মাধ্যমে কারিগরদের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু কারখানা যান্ত্রিকভাবে পণ্য উৎপাদনের (ত্রের বাইরে ছিল। অন্য ভাষায়

বলা যায়, মূলধন ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক মূলধন এবং অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রচলন বাড়লেও শিল্পে আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রাধান্য ছিল।

এই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত(কোন সমাজে কেন পূর্ণমাত্রায় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল না সেসম্পর্কে বহু কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। অতীতের চিন্তা অনুসারে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং জাতপাতের প্রাধান্য বাণিজ্যের বিস্তার রোধ করার (ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ ছিল না। ধনতন্ত্রের বিকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি শর্ত পালনে ভারতীয় সমাজ ব্যর্থ হয়।

এ(ে ত্রে এটি চিন্তা করে দেখা উচিত যে একটি (ুদ্র শাসক শ্রেণীর দ্বারা কৃষকদের প্রত্য(ভাবে শোষণের উপর সমগ্র বাণিজ্যিক কাঠামো নির্ভর করত। বাস্তবে শহরে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের জন্য কোন গ্রামে বাজার ছিল না। এভাবে গ্রামের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্য শহরে বিত্রি(করার প্রয়োজন থেকেই গ্রামে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন দেখা দেয়।

অবশেষে কৃষিব্যবস্থায় যখন সংকটের সূত্রপাত হয় তখন অর্থনীতির সমগ্র কাঠামোর মধ্যে সেই সমস্যা ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভারতবর্ষে। শুধুমাত্র বাণিজ্যের (ুদ্র গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা মূলধন নিজের জন্য কোন স্বাধীন ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার (ে ত্রে ব্যর্থ হয়। মুঘল শাসক সম্প্রদায়ের উপরই মূলধনের ভাগ্য নির্ভর করত। শাসক সম্প্রদায়ের পদ্ধতি ও সংগঠন অন্য শ্রেণীর মানুষরাও অনুকরণ করতে চেষ্টা করত। এজন্য ত্র(মশ শাসক শ্রেণীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ মূলধন বিনিয়োগ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

একক ৮ ❑ মুঘল নগরায়ন

৮.০ মুঘল ভারতে নগরায়নের চরিত্র
৮.১ মুঘল স্থাপত্যশিল্প
৮.২ মুঘল চিত্রকলা
৮.৩ অনুশীলনী
৮.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ মুঘল ভারতে নগরায়ণের চরিত্র—মুঘল শহরের শ্রেণীবিন্যাস

মুঘল ভারতে নগর ও নগরজীবন দেশের অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পরিচায়ক ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের শক্তি(বৃদ্ধি, পরিবহনব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং মুঘল আইনের প্রভাবের ফলে নগরায়ণের গতি আরো বৃদ্ধি পায়। রাজধানী, প্রশাসন, বাণিজ্য ও তীর্থযাত্রার কেন্দ্র হিসেবে শহর গড়ে ওঠে। আকবরের সাম্রাজ্যে ১২০টি বড় নগর এবং ৩২০০টি গ্রামকেন্দ্রিক শহর বা কসবা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃহত্তম নগর ছিল আগ্রা, প্রায় ৫০০,০০০ জনসংখ্যা সমেত। সম্রাট নগরে উপস্থিত থাকলে জনসংখ্যা বেড়ে ৬০০,০০০ হত। ঢাকা, রাজমহল, মসুলীপতম ছিল অন্যান্য বড় শহর।

এই শহরগুলির চরিত্র এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের ভূমিকা থেকে দেখা যায় যে মুঘল ভারতে যথেষ্ট পরিমান নগরায়ন ঘটে। অত্যন্ত বড় নগরগুলি ত্র(মবর্ধমান পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, বাণিজ্য, তেজারতি কারবার এবং শিল্পোদ্যগের গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে সড়কপথ ও জলপথের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষ ও দ(িণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ র(া করত।

ইউরোপের বহু শহরের মত ভারতে শহরগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও আইনগত দিক থেকে স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল না বলে কিছু ঐতিহাসিক দাবী করেছেন। বড় শহরগুলিতে প্রাসাদোপম অট্টালিকার সঙ্গে বস্তির সহাবস্থান ঘটে। প্রত্যেক শহরে একটি বা দুটি প্রধান সড়ক ছিল যার সঙ্গে অন্য সব পথের সংযোগস্থলকে চক বলা হত। রাস্তাগুলি সাধারণত বাঁধান থাকত। শহরগুলি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হত এবং প্রতিটি অংশে এক বিশেষ জাতি বা পেশার লোক বাস করত।

ঐতিহাসিকরা নাগরিক সমাজের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। নগর জীবনের সব প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করাই শহরের প্রশাসনিক কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

৮.১ মুঘল স্থাপত্যশিল্প

সাধারণত বলা হয় যে শিল্প ও স্থাপত্য একটি সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগে জীবনের নিরাপত্তা, প্রশাসনের স্থায়িত্ব, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জনহিতৈষী ও সংস্কৃতিবান শাসকদের শাসন শিল্পস্থাপত্যের যথেষ্ট অগ্রগতির এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আওরঙ্গজেবের শাসনের পরবর্তীকালে এই অনুকূল পরিবেশের অবসান ঘটলে শিল্প ও স্থাপত্যের অবনতি দেখা দেয়। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহানের একশ বছরের শাসনকালে সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্যের অনবদ্য বিকাশের জন্য এই সময়টি মুঘল সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই তিনজন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং এর পরিধির বিস্তার ঘটতে থাকে।

তানসেন সম্পর্কে আবুল ফজল লিখেছেন যে গত একহাজার বছরে এমন সঙ্গীত শিল্পী ভারতে ছিলেন না। তানসেনের সমসাময়িক মালবের রাজবাহাদুরকে সঙ্গীতশাস্ত্র ও হিন্দী সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েই চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আকবর চিত্রশিল্পীদের ছবি আঁকাকে ঈ(রের উপাসনার অন্যতম মাধ্যম আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে সম্রাট তাঁর সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল লিখেছেন যে আকবর চিত্রশিল্পকে শি(া ও বিনোদন, উভয়েরই মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। এভাবে চিত্রকলার অগ্রগতি ঘটলে বহু চিত্রশিল্পী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। দারোগা ও করণিকরা প্রতি সপ্তাহে সমস্ত চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি সম্রাটের সামনে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করত। কর্মনৈপুণ্য অনুযায়ী তিনি চিত্রশিল্পীদের পুরস্কৃত করতেন বা মাসিক বেতন বাড়িয়ে দিতেন। চিত্রশিল্পের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকায় জাহাঙ্গীর চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁর রাজত্বকালে (দ্রচিত্রের অঙ্কনশিল্প উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছয়।

স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে বলা যায় যে প্রত্যেক মুঘল সম্রাট স্থাপত্যের অগ্রগতি ও বিকাশের (ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। মুঘলরা উন্নতমানের স্থপতি ছিল এবং বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতমানের স্থাপত্য সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং স্থাপত্যশিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। দিল্লী ও আগ্রার নির্মাণশিল্পে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বাবর কনস্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত স্থপতি সিনার শিষ্যদের নিজের গৃহনির্মাণের কাজে নিযুক্ত(করেন। দুর্ভাগ্যত্র(মে বাবরের শাসনকালের প্রায় সমস্ত স্থাপত্য বিনষ্ট হলেও পানিপথের কাবুলবাগ এবং সম্বলের জামা মসজিদের এখনও অস্তিত্ব আছে। পার্সি ব্রাউন লিখেছেন যে সুযোগ পেলে বাবরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুমায়ুনও একটির বেশী স্মৃতিসৌধ রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শান্তিপূর্ণ অবসর তাঁর ছিল না। দিনপনাহ নামে একটি নতুন শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করলেও তার বাস্তব রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে শুধুমাত্র আগ্রা ও হিসারের ফতেবাদে দুটি মসজিদ টিকে আছে। হুমায়ুনের কাছ থেকে ভারতবর্ষ শাসন করার অধিকার যারা ছিনিয়ে নেয় সেই মূর সুলতানরা স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে। তাদের নির্মিত দুর্গ ও অন্যান্য সৌধ মধ্যযুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অন্যতম। শের শাহের শাসনকালের দুটি বিখ্যাত নির্মাণ ছিল কিলা কোহানা বা দিল্লীর পুরানা কিলা ও সাসারামে সম্রাটের স্মৃতিসৌধ। পার্সি ব্রাউন এই স্মৃতিসৌধকে ভারতের স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন। এটি খুবই দুঃখের যে শেহশাহ কিলা কোহানার নির্মাণ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, কিন্তু সেখানের কিলা-ই-কোহানা মসজিদ উত্তরভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যগুলির অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের দ্রুত অগ্রগতি দেখা যায়। রাজনৈতিক পরিবেশে স্থায়িত্ব আসার পর আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থাপত্যশিল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আবুল ফজলের লেখা অনুসারে নির্মাণের পরিকল্পনার (ে ত্রে আকবর তাঁর সহনশীলতা, হিন্দু ও ইসলামি সংস্কৃতির সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাঁর সৌধগুলিতে হিন্দু ও ইসলামি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সরস্বতী লিখেছেন যে আকবরের স্থাপত্য মহত্ত্ব, শক্তি(র পরিচায়ক ছিল এবং তাঁর বিচ(ণ পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় শিল্প আন্দোলনের সূচনা হয়। (The History and Culture of the Indian People–Vol.VII, The Mughal Empire, 1974-Page –711).

আকবরের শাসনের সূচনায় ১৫৬৫ সালে হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হাজি বেগমের তত্ত্বাবধানে এটি তৈরী হয় এবং এর স্থপতি ছিলেন মীরক মীর্জা গিয়াস। এতে পারসী প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। পার্সি ব্রাউন এটিকে পারসী রীতিতে তৈরী ভারতীয় সৌধ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই ধরনের নির্মাণের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল একটি বাগানের কেন্দ্রে সৌধটি স্থাপন করা। এরপর কাশিম খানের তত্ত্বাবধানে আকবর আগ্রা ও লাহোরে দুটি দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ তৈরী করেন। ১৫৬৪ সালে শু(হয়ে আটবছর পর আগ্রায়-এর নির্মাণ শেষ হয়। এই প্রাসাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল গোয়ালিয়র দুর্গের যার প্রশংসা করেছিলেন বাবর। দুর্গের প্রাচীর প্রায় ৭০ ফুট উঁচু এবং প্রায়

১½ মাইল পরিধি জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বলা হয় যে এর আগে কখনো এমন দুর্গ নির্মিত হয়নি যাতে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত লোহাদ্বারা পাথর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ছিল। দুর্গের দুটি প্রবেশপথ ছিল— হাতিপথ এবং অমরসিংহ পথ যার মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রবেশের জন্য নিজস্ব ব্যবহৃত হত। দুর্গের মধ্যের স্থাপত্যের বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস এবং জাহাঙ্গীরমহল।

আগ্রা থকে ২৬ মাইল দূরে সিত্রীর কাছে একটি টিলার উপরে আকবর একটি নতুন রাজধানী গড়ে তোলেন এবং এর নাম দেন ফতেপুর সিত্রী। তাঁর স্মৃতিকথায় জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছরে বন্য পশুতে ভরা টিলাটি বিভিন্ন ধরনের বাগান, অট্টালিকা, প্রাসাদে পরিপূর্ণ এক শহর হয়ে ওঠে। ফার্গুসন শহরটিকে আকবরের মানসিকতার প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছেন। শহরটিতে বহু প্রাসাদ, কর্মশালা, সরাইখানা, দরবার এবং ধর্মীয় উপাসনাস্থল ছিল। এইসব গৃহগুলিতেই হিন্দু ও স্থানীয় শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। স্থাপত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন ছিল জামা মসজিদ ও বুলন্দ দরওয়াজা। জামা মসজিদকে ফতেপুর সিত্রীর গৌরব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আকবরের দা(ি ণাত্য বিজয়ের প্রতীক হিসেবে ১৬০২ সালে তৈরী বুলন্দ দরওয়াজা ভারতের বৃহত্তম প্রবেশপথ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রবেশদ্বারের অন্যতম। ফতেপুর সিত্রীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গৃহগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল যোধাবাঈয়ের, তুর্কী সুলতানা, বীরবলের প্রাসাদ, পাঁচমহল, খোয়াবাগ। দেওয়ানী খাসের কা(কার্যখচিত থাম এবং ইবাদৎখানার নকশাও ছিল অতিসুন্দর। আকবরের শাসনকালের গৃহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এলাহাবাদের ৪০টি থামের প্রাসাদ এবং সিকান্দ্রায় সম্রাটের সমাধি। উইলিয়াম কিঞ্চের বক্ত(ব্য অনুসারে ৪০ বছরে এলাহাবাদের প্রাসাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় কয়েক হাজার শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে। আকবর নিজেই সিকান্দ্রায় তাঁর সমাধি নির্মাণ শু(করেন এবং জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সেটি সম্পূর্ণ হয়। ডঃ ঈ(রী প্রসাদের মতে বৌদ্ধ বিহারের আদলে এই সমাধি তৈরী হয়। অধ্যাপক জাফর সমাধিগুলির মধ্যে এটিকে অদ্বিতীয় ঘোষণা করেছেন।

আকবরের মৃত্যুর পর, জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান উভয়েই সৌন্দর্যের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। তাঁদের আমলে স্থাপত্যকলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্দৌলার সমাধি। Cambridge History of India গ্রন্থে এই স্মৃতিসৌধের প্রশংসা করে পার্সি ব্রাউন লিখেছেন যে নির্মাণের সূক্ষ্মতার এবং কা(কার্যের সূচীতার বিচারে মুঘল স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে এটি অদ্বিতীয়। সৌধটি প্রায় ৬৯ ফুট চওড়া এবং ধবধবে সাদা মার্বেল পাথর ও মূল্যবান পাথরের নকশায় স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন। মুঘলযুগে এটিই প্রথম স্থাপত্য যেটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেলে নির্মিত এবং Pictra Dura নামে পরিচিত কা(কার্য এতে প্রথম দেখা দেয়। যান্ত্রিক দিক থেকে বিচার করলে এটি নির্মাণশিল্পের বিবর্তনের একটি গু(ত্বপূর্ণ স্তর, কারণ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সরল (চি অনুযায়ী বেলেপাথরের সৌধ থেকে শাহাজানের মার্বেল ও Pictra Durar নির্মাণের রূপান্তরকে এটি সূচিত করে।

শাজাহান স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তার শাসনকালকে মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া হয়। ডঃ দত্তের মতে আকবরের সৌধের তুলনায় শাজাহানের নির্মাণগুলি ঔজ্জ্বল্য ও সৃজনশীলতার বিচারে কম হলেও, জাঁকজমক ও উন্নতমানের সূক্ষ্ম কা(কার্যের জন্য প্রশংসনীয়। ডঃ ঈ(রী প্রসাদ লিখেছেন যে শাজাহান স্থাপত্যের উপর কা(কার্যকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যান এবং তাঁর সব নির্মাণে অলঙ্কার নির্মাতা ও চিত্রকরের শিল্পের সমন্বয় ঘটে। মার্বেলের সাহায্যে শহর গড়ে তোলার জন্য পার্সি ব্রাউন শাজাহানের প্রশংসা করেছেন। পিতৃপু(ষদের তৈরী বেলেপাথরের বহু সৌধ ভেঙে তিনি মার্বেলের প্রাসাদ তৈরী করেন। আগ্রার দুর্গের দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, খাস মহল, শিস মহল, অঙ্গুরী বাগ, মোতি মসজিদ এভাবে পুর্ননির্মিত হয়।

আকবরের মত, শাহাজান ১৬৩৮ সালে দিল্লীর কাছে শাজাহানাবাদ নামে একটি নতুন রাজধানী তৈরী করা শু(করেন। যমুনার তীরে চারকোণা একটি শহর গড়ে তোলা হয়। প্রাসাদ ছিল যমুনার ঠিক পাশেই এবং দুর্গের প্রধান ফটক ও শহরের প্রবেশদ্বার থেকে আসা দুটি বিস্তৃত পথের সংযোগস্থলে জামা মসজিদ স্থাপিত হয়। দুর্গের প্রাচীর

লাল বেলেপাথরে নির্মিত হওয়ায় এটিকে Red Fort বলা হত। দুর্গের মধ্যে প্রাসাদ, সানগৃহ, রাজদরবার, বাগান প্রভৃতি রাজকীয় জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৬৪৮ সালে এক পবিত্র দিনে সম্রাট নতুন রাজধানীর উদ্বোধন করেন বহু আনন্দপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই লাল দুর্গটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌধগুলি ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, রঙ্গ মহল, মোতিমহল, নহর-ই-শিশ। এসবের মধ্যে দিওয়ান-ই-খাস সত্যি অপূর্ব সুন্দর ছিল। এর উপর লেখা ছিল, যদি পৃথিবী কখনো স্বর্গে পরিণত হয় এটি তাই এবং অন্য কোন কিছু তা হতে পারে না।

দিল্লীর রেড ফোর্টের বাইরে জামামসজিদ ধার্মিকদের আকৃষ্ট করত এবং ইসলামের গৌরবের দ্যোতক ছিল। ধর্মীয় স্থাপত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এটি। মসজিদের ভেতরের কা(কার্য খুবই সাধারণ ছিল পাছে শিল্পের সৌন্দর্য প্রার্থনার জন্য সমবেত জনগণের মনসংযোগে বিঘ্ন না ঘটায়।

মুঘল স্থাপত্য ও শাজাহানের আমলের স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল আগ্রার তাজমহল। প্রিয় মহিষী আরজুমবানু বা মুমতাজ মহলের স্মৃতিতে সম্রাট এই সৌধটি নির্মাণ করেন। ১৬৩১ সালে রাণীর মৃত্যুর এক বছর পরে এর নির্মাণকার্য শু(হয় এবং ২২ বছরে এটি সম্পূর্ণ হয়। ডঃ ঈ(রী প্রসাদ তাজমহল নির্মাণের মোট ব্যয় প্রায় তিন কোটি টাকা বলেছেন। আবদুর হামিদ লাহোরীর হিসেব অনুযায়ী সেটি ছিল ৫০ ল(টাকা। প্রথমে নির্মাণ শু(র আগে বহু পরিকল্পনা ও নকশা করা হয়। কাঠের তৈরী একটি (দ্র উদাহরণ অনুসরণ করে স্থপতিরা এর নির্মাণ শু(করেন। বার্ষিক একহাজার টাকা বেতনে ওস্তাদ ঈশা নির্মাণের তত্ত্বাবধান করতেন। ১৬৪১ সালে আগ্রায় আসা স্পেনীয় পর্যটক কাদার মানরিকের মতে, জিরোনিমো ভেরেনিও নামে এক ভেনিসের অধিবাসী তাজমহলের নকশা তৈরী করেন। ভারতীয় লেখকরা এই মতের বিরোধিতা করেছেন। ১৬৬৬ সালে আওরঙ্গজেবের সময়ের ফরাসী পর্যটক থিডেন্টে তাজমহল ভ্রমণের পর বলেন যে, তাজমহল প্রমাণ করে যে স্থাপত্যবিদ্যায় ভারতীয়রা অজ্ঞ নয় এবং ইউরোপীয়দের কাছে এই নির্মাণরীতি বিস্ময়কর হলেও এটি সু(চি এবং সূক্ষ্মতার পরিচায়ক।

তাজমহলের সৌন্দর্য্য ও কা(কার্য দেখে বহু ব্যক্তি(মুগ্ধ হয়েছেন। কীনের মতে তাজমহলের মত আকর্ষণ পৃথিবীর অন্য কোন সৌধের নেই। স্ট্যানলি লেনপুলের বক্ত(ব্য, তাজমহল স্বয়ং ঈ(রের পরিকল্পিত এবং অলঙ্কারশিল্পীদের দ্বারা মার্বেলে রচিত স্বপ্ন। ফার্গুসন বলেছেন যে, তাজমহলের সৌন্দর্য স্বর্গীয় এবং এটিতে প্রাকৃতিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্যের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। অধ্যাপক এস. কে. সরস্বতী বলেছেন যে, তাজমহল জনগনকে মুগ্ধ করে এবং মূক মার্বেলের মধ্যে প্রকাশিত অবিন(র ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয়কে ভরিয়ে তোলে। ডঃ ঈ(রী প্রসাদ তাজমহলকে দাম্পত্য প্রেম ও বি(স্তৃতার শ্রেষ্ঠ সৌধ আখ্যা দিয়েছেন। তাজমহলের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হল দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোণ থেকে একে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। পার্সি ব্রাউন মন্তব্য করেছেন যে, পূর্ণিমার রাতে তাজমহলকে দেখে মনে হয় যে প্রকৃতি এবং ঈ(র একত্রে নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে অপূর্ব সুন্দর এই সৌধ গড়ে তুলেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় এক বৃটিশ পর্যটক তাজমহল দেখার অনুভূতিকে অনন্য বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাজমহলকে শাজাহানের দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের অশ্রু দিয়ে তৈরী বলে বর্ণনা করেছেন। স্যার এডউইন আর্নল্ডের বক্ত(ব্য অনুসারে তাজমহল সম্রাটের ভালবাসা, আত্মা ও মানসিকতার প্রতীক।

আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের পর শিল্প ও স্থাপত্যে অব(য়ের সূচনা হয়। তাঁর শাসনে শুধুমাত্র দিল্লীতে রেড ফোর্টের মধ্যে মোতি মসজিদ নামে একটি ছোট মার্বেলের মসজিদ, বারাণসীতে বি(নাথের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর আরেকটি মসজিদ এবং লাহোরে বাদশাহী মসজিদ নির্মিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল স্থাপত্যশিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

৮.২ মুঘল চিত্রকলা

ডঃ এ.কে. দাস লিখেছেন যে মুঘল রীতির চিত্রকলা ভারতীয় শিল্পে এক গু(ত্বপূর্ণ যুগের সূচনা করে। যদিও পাণিপথের যুদ্ধের বাবরের বিজয়ের বহু আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে পান্ডুলিপির অলঙ্করণের জন্য (দ্রচিত্রের প্রচলন ছিল, মুঘল শাসনে ঐতিহাসিক ঘটনা, সাহিত্যের কাহিনী, রাজ দরবারের দৃশ্য, মানুষের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিভিন্ন বিষয়ের (দ্রচিত্র ভারতীয় শিল্পে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটায়। চিন্তায় ও কা(কার্যে মুঘল (দ্রচিত্রের প্রভাব দা(ণাত্য, রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং উত্তরভারতে মুঘল শাসনের পরেও বিশেষভাবে ল(্য করা যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর শিল্প ও সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। বলা হয় যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি তিনি তার সঙ্গে ভারতে নিয়ে আসেন। সেসময়ে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ছিল চৈনিক অঙ্কনরীতি যাতে ভারতীয়, বৌদ্ধ, পারসিক, ব্যাকট্রিয়া ও মঙ্গোলীদীয় রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাবরের সমসাময়িক চিত্রকরদের মধ্যে পারস্যের বিহজাদ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, যাঁকে অন্য শিল্পীরা অনুকরণ করতেন। প্রথমে পারসিক রীতিতেই ভারতীয় শিল্পীরা ছবি আঁকার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক এস. এম. জাফরের মতে এই সময়ের চিত্রকলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পীদের নিজস্ব শৈলী। প্রত্যেক চিত্রের প্রতিটি দৃশ্যে নরনারী, পশুপাখি, ফুলফল, অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত পরিষ্কার ও নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠায় যুদ্ধের দৃশ্যে যোদ্ধাদের বা সঙ্গীতানুষ্ঠানের দৃশ্যে নর্তকীদের চিহ্নি(ত করতে কোন বিভ্রান্তি ঘটত না। এমনকী গাছের পাতাগুলি সুন্দরভাবে আঁকা হওয়ায় সেগুলি সহজেই গোনা সম্ভব হত।

দুর্ভাগ্যত্র(মে বিহজাদের রীতিতে অঙ্কনশিল্পের বিকাশ ঘটানোর আগেই বাবরের মৃত্যু হয়। রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য শিল্পের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতে ব্যর্থ হলেও পারস্যে বাধ্যতামূলক নির্বাসনের সময় বাবরের পুত্র হুমায়ুন সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলায় আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং শের শাহ শূরীর মৃত্যুর পর ভারতে নিজের সাম্রাজ্য পুন(দ্ধারে স(ম হলে তিনি মীর সৈয়দ আলী এবং খাজা আবদুস সামাদ নামে পারস্যের দুজন বিখ্যাত শিল্পীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন। বি(্বাস করা হয় যে সম্রাট ও তাঁর শিশুপুত্র আকবর উভয়েই এই শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে ছবি আঁকা শেখেন এবং একটি বিশেষ আশীর্বাদ প্রমাণিত হয় যখন ভারতবর্ষের সম্রাট হিসেবে আকবর তাঁর রাজত্বকালে চিত্রকলার সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এভাবে ভারতীয় চিত্রকলায় এক জাতীয় রীতির উদ্ভব ঘটে। খাজা আবদুস সামাদের নেতৃত্বে চিত্রকলার জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলেন আকবর। এই বিভাগের কার্যকলাপের (ে ত্রে সম্রাটের ব্যক্তি(গত উৎসাহ ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন যে ধর্মান্ধ ব্যক্তি(রা প্রথমে চিত্রকলার বিরোধিতা করলেও পরে তাদের দৃষ্টিতে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথমে ভারতীয় চিত্রের উপর চৈনিক ও পারসিক রীতির প্রভাব দেখা যেত এবং অঙ্কনশাস্ত্রের উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল দাস্তান-ই-আমীর-হামজা যা হামজানামা। ডঃ দাসের মতে এই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটির বিশেষত্ব ছিল রঙীন ফুল, লতাপাতা, স্থাপত্যশিল্পের ও আসবাবপত্রের নিঁখুত চিত্র এবং উৎকৃষ্ট মানের রঙের ব্যবহার। মুঘল রাজসভায় তানসেনের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্প একটি নতুন দিকে মোড় নেয় এবং চৈনিক, পারসিক ও হিন্দু অঙ্কনশৈলীর বিকাশ ঘটে। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফতেপুর সিত্রীর রাজসভায় বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা আসেন। আবুল ফজল গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে একশর বেশী চিত্রকর তাঁদের শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং বহুজন শ্রেষ্ঠত্বের কাছাকাছি পৌঁছন। চিত্রশিল্পে হিন্দুদের মত দ(পৃথিবীতে খুব খুব কম শিল্পী আছেন। তিনি দশয়ন্ত, বাসওয়ান, কেশব, লাল, মুকুন্দ, মিশিকিন, ফা(ক, মধু, জগন, মহেশ, (ে মকারারি, তাবা, সানওয়ালা, হরিবংশ, রাম নামে পনেরোজন বিখ্যাত শিল্পীর উল্লেখ করেছেন যাদের অধিকাংশই হিন্দু। সব চিত্রকরই পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে কাজ করতেন এবং প্রতিকৃতি, পশুপ(ী সক্কল এবং পান্ডুলিপি অলঙ্করণে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। চিঙ্গীজনামা, জাফরনামা, রাজনামা, রামায়ণ, কালীয়দমন প্রভৃতি চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ফতেপুর সিত্রীতে আকবরের প্রাসাদের দেওয়ালে

রাজশিল্পীরা অপূর্ব সুন্দর ছবি আঁকেন। সম্রাট এবং রাজপরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত।

তাঁর বিখ্যাত পিতার মতই জাহাঙ্গীরও সৌন্দর্য ও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজপুত্র থাকাকালীন আকা রিজা নামে হেরাটের এক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে তিনি একটি চিত্রাঙ্কনকেন্দ্র গড়ে তোলেন। রাজকুমারান্দ গজল ও আমীর নিজামুদ্দিন হাসান দি(োভীর (বাই ছিল এসময়ের দুটি শ্রেষ্ঠ চিত্র। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছয়।

(দ্রচিত্রের ধ্রুপদী রীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জাহাঙ্গীর দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চিত্র সংগ্রহ করতেন। নিজের স্মৃতিকথার গর্বের সঙ্গে জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে ছবি আঁকা দেখেই তিনি কোনটি কোন চিত্রকরের বুঝতে পারতেন এবং একটি প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শিল্পী আঁকলে কোন অংশ কোন শিল্পী এঁকেছে বলে দিতে পারতেন। এই আত্মপ্রশংসা অর্থহীন ছিল না কারণ আকবরের সময়ে শু(হওয়া মুঘল (দ্রচিত্রশিল্প, জাহাঙ্গীরের শাসনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। ভারতীয় শিল্পকে পারসিক প্রভাব থেকে মুক্ত(করে একটি স্বাধীন ভারতীয় রীতি সৃষ্টি ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে প্রতিকৃতিচিত্রে জাহাঙ্গীর আগ্রহী হন এবং সম্রাট, তাঁর পরিবারের সদস্য, উল্লেখযোগ্য সভাসদ এবং শিল্প, ধর্ম, সাহিত্যের (ে ত্রে বিখ্যাত ব্যক্তি(দের প্রতিকৃতি আঁকা হয়। রাজসভার বিখ্যাত চিত্রকর বিষণদাসকে তিনি পাঠান পারস্যের সম্রাটের পূর্ণাবয়ব এবং তাঁর সভাসদদের প্রতিকৃতি আঁকতে। প্রতিকৃতি অঙ্কন কোন নতুন ঘটনা না হলেও জাহাঙ্গীরের সময়ে এই শিল্পের উন্নতি ঘটে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বিখ্যাত মুসলমান চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আকা রাজা ও তাঁর পুত্র হেরাটের আবুল হাসান, সমরখন্দের মুহম্মদ মুরাদ, ওস্তাদ মানসুর। হিন্দু চিত্রকরদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বিষণদাস, মনোহর, মাধব, কেশব ভ্রাতৃদ্বয়, তুলসী, গোবর্ধন। বৃ(, ফুল, পশু, পাখী আঁকায় তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহাজান চিত্রশিল্পের তুলনায় স্থাপত্য শিল্পে বেশী আগ্রহী হওয়ায় মুঘল চিত্রকলার গৌরব হ্রাস পেতে থাকে। যদিও রাজশিল্পীরা বহু সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেন, তবুও তাদের নান্দনিক উৎকর্ষ হারিয়ে যায়। সেগুলিতে কা(কার্যের বিস্তার ও বাহুল্য দেখা যায় এবং সম্রাটকে সবসময় উৎকৃষ্ট পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত অবস্থায় সম্রাটকে সবসময়ে দেখা যেত। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে রাজসভায় চিত্রশিল্পীর সংখ্যা ত্র(মশ কমতে থাকে। গু(ত্বপূর্ণ শিল্পীরা ছিলেন মীর হাশিম, অনুপ, চিত্র, চিত্রমণি ও ফকি(ল্লা যিনি ছিলেন চিত্রকরদের প্রশি(ক। শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু শাজাহানের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন আওরঙ্গজেব। সমস্ত শৈল্পিক ত্রি(য়াকলাপের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং শিল্পে রাষ্ট্রের সত্রি(য় পৃষ্ঠপোষকতার তিনি অবসান ঘটান। বলা হয় যে বিজাপুর ও গোলকুন্ডার প্রাসাদের দেওয়ালচিত্র তিনি বিনষ্ট করেন এবং সিকান্দ্রায় আকবরের স্মৃতিসৌধের চিত্রের উপর সাদা রং করান। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময়ে চিত্রকররা আঞ্চলিক রাজ্যগুলির রাজসভায় চলে গেলেও শিল্পের হৃতগৌরব পুন(দ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

৮.৩ অনুশীলনী

১। শাজাহানের পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত যুদ্ধ যুক্তি(দ্বারা বি(ে-ষণ কর। এই যুদ্ধেআওরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণের বর্ণনা দাও।

২। আওরঙ্গজেবের রাজপুত নীতির মূল উদ্দেশ্য ও তার ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ধর্মের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যগুলি কতটা জড়িত ছিল?

৩। আওরঙ্গজেবের দা(ণাত্য নীতির বর্ণনা দাও। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য এটি কতটা দায়ী ছিল?

৪। মুঘল সাম্রাজ্যে জায়গীরদারী সংকটের বিবরণ দাও। এটি কিভাবে একটি কৃত্রিম সমস্যা ছিল?

৫। মুঘল ভারতে জাঠ ও সৎনামী বিদ্রোহ যুক্তি(সহ বি(-ষণ কর। এসব গণবিদ্রোহের চরিত্রের বর্ণনা দাও।

৬। মুঘল ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

৭। বস্ত্রশিল্পের ভূমিকার উপর গু(ত্ব দিয়ে মুঘল ভারতে অকৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন যুক্তি(সহ আলোচনা কর।

৮। মুঘল ভারতে ধনতন্ত্রের বিস্তারের কোন সম্ভাবনা ছিল কি?

৯। মুঘল ভারতে নগরায়নের বর্ণনা দাও।

১০। মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প সম্পর্কে যুক্তি(সহ আলোচনা কর।

৮.৪ গ্রন্থপঞ্জী

1. Satish Chandra – Medieval India.
2. Irfan Habib – Essays in Indian History.
3. Irfan Habib – Agrarian System in Medieval India
4. Tara Chand – Society and State in the Mughal Period.
5. Irfan Habib and Tapan Raychaudhury (ed) Cambridge Economic History of India Vol. – I.

৬। গৌতম ভদ্র — মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ

৭। ইরফান হাবিব—মুঘল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস

8. Richard Halissey – The Rajpat Rebellion Under Aurangzeb.
9. P.N. Chopra – Society and Culture during the Mughal Age.
10. W.H. Moreland – Agrarian System of Moslem India.
11. Irfan Habib (ed.) – Akbar and His India.
12. Muzaffar Alam (ed.) – The Mughal State.